বাংলা গণসংগীতের পাঁচ দশক (১৯৪০-১৯৯০) : একটি পর্যালোচনা

এম. ফিল. (বাংলা) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক ড. শম্পা চৌধুরী

গবেষক : মধুরিমা গুহ রায়

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৯

ক্রমিক সংখ্যা : ০০১৭০০১০৩০০৩

পরীক্ষা ক্রমিক সংখ্যা : MPBE194003

রেজিস্ট্রেশন নং : 110970 of 2010-11

This is to certify that the following papers continue original research on "বাংলা গণসংগীতের পাঁচ দশক (১৯৪০-১৯৯০) : একটি পর্যালোচনা" by Madhurima Guha Ray to be submitted in order to fulfill partial requirement of degree of M. Phil (Bengali). I further certify that neither this dissertation nor a part of it has been submitted in any other University for any diploma or degree.

Head

.....

Dept. of Bengali

Jadavpur University

Supervisor

.....

Dept. of Bengali

Jadavpur University

মুখবন্ধ

গানের প্রতি টান থেকেই এ কাজ করতে আসা। এসে বুঝতে পেরেছি, গান শোনা একরকম, কিন্তু তা নিয়ে তাত্ত্বিক ও তথ্যমূলক আলোচনার কাজ আদৌ স্বস্তিদায়ক নয়। অস্বস্তিতে পড়ার পর বইপত্র বন্ধ রেখে কিছু সময়ের জন্য, শুনেছি ওই গানগুলিই, যেগুলিকে নিয়ে নাড়াঘাঁটা করছি গত একবছর। অস্বস্তি মুহূর্তে স্বস্তি, এমনকি শান্তিতে পাল্টে গেছে। আমি এই গানগুলির কাছে ঋণী রয়ে গেলাম আজীবন, এই কাজেরই সূত্রে। এতকাল কষ্টে, যন্ত্রণায় রবীন্দ্রনাথের গান শুনেছি, পড়েছি, গেয়েছি; আজ বুঝি, এই গণচেতনার গানগুলির স্তবকে স্তবকে ভরে রাখা নতুন জীবনের আলো, তাই তাদেরও সাথী করে নিলাম।

এই ভালোলাগা, ভালোবাসার বাইরে বেরিয়ে কাজটা সুষ্ঠুভাবে করবার চেষ্টা করেছি। এত মানুষের সহযোগিতা পেয়েছি যে, আপ্লুত আমি। এই গবেষণাকার্যের তত্ত্বাবধায়ক ড. শম্পা চৌধুরীর কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সমস্ত ভুলভ্রান্তি আমার নিজগুণে ক্ষমা করে, সংশোধন করে দিয়েছেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত RAC কমিটির মিটিং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. অভিজিৎ রায় ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. জয়দীপ ঘোষ - এঁরা গবেষণাসন্দর্ভের অধ্যায় বিভাজন নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়েছেন। বাংলা বিভাগের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান ড. বরেন্দু মন্ডল গুরুত্বপূর্ণ একটি বইয়ের হদিস দিয়েছিলেন, সে বই পাওয়া গেছে তাঁর সূত্রেই। এই বিভাগেরই অধ্যাপক ড. শেখর সমাদ্দার উপযাচক হয়ে একটি চমৎকার বই আমার হাতে তুলে দিয়ে আমায় অবাক করে দিয়েছেন! এঁদের সবার প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

সংগীতপ্রেমী ও সংগীত সংগ্রাহক আলো কুণ্ডুর সূত্রে আলাপ করি আমি কুলটি কলেজের অধ্যাপক শ্রী প্রিয়দর্শী চক্রবর্তীর সঙ্গে। সম্পূর্ণ অপরিচিতের হাতে জানিনা কী ভরসায় একটি দুষ্প্রাপ্য বই তিনি তুলে দিয়েছেন! এ ছাড়া বই দিয়ে, বইয়ের খোঁজ দিয়ে সবচেয়ে

বেশি সাহায্য করেছেন ড. বর্ণালি মৈত্র ঘোষ। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা নয়, ভালোবাসা। নিজেদের বই দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করতে দিয়েছেন আমার দুই কাছের মানুষ বিপ্লব গুহ রায় ও দেবাশিস গুপ্ত। এঁদেরও ভালোবাসা জানাই। ড. তপশ্রী দাস, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রসংগীত বিভাগের অধ্যাপিকা, তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের বই ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে দিয়ে আমায় মুগ্ধ করেছেন। আন্তরিক ধন্যবাদ তাঁকে। ব্যস্ত গায়ক ও গণসংগীত রচয়িতা শুভেন্দু মাইতির কাছে ঋণ যথেষ্ট, আমাকে কিছু সময় দেওয়ার জন্য। তাঁকে প্রণাম সবশেষে।

সূচিপত্র

ভূমিকা	:		1-7
প্রথম অধ্যায়	:	বাংলা গণসংগীতের উৎস সন্ধানে	8-37
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	বাংলা গণসংগীতের পাঁচ দশক (১৯৪০-১৯৯০) নির্বাচিত গীতিকারের গান : লোকপ্রিয়তার নিরিখে বিশ্লেষণ	38-89
তৃতীয় অধ্যায়	:	আধুনিক বাংলা গানে গণসংগীতের প্রভাব	90-135
উপসংহার	:		136-141
গ্রন্থপঞ্জি	:		142-144
পত্রপত্রিকাপঞ্জি	:		145-146
পরিশিষ্ট	:		147-155

ভূমিকা

'গণসংগীত' কাকে বলে, তা স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া দরকার প্রথমেই। গুণীজনেরা বিভিন্ন আলোচনায় 'গণসংগীত'কে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

'গণসংগীত সংগ্রহ' এর সম্পাদক সুব্রত রুদ্র বলেছেন- "অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে যে গান সোচ্চার, মানুষের দুঃখ দুর্দশাকে দূর করার জন্য, তাকে সুস্থ সুন্দর জীবনে নিয়ে আসার জন্য পথ দেখায় যে গান, তা ই গণসংগীত।"[১]

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতে- "স্বাদেশিকতার ধারা যেখানে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার সাগরে গিয়ে মিশেছে, সেই মোহনায় গণসংগীতের জন্ম।"[২]

রত্না ভট্টাচার্যের মতে, "আধুনিক শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের গানই গণসংগীত।"[৩]

দিলীপ সেনগুপ্তর কথায় "মূলত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, শ্রমিক শ্রেণির চেতনা এবং আন্তর্জাতিকতা বোধের উপাদান নিয়ে সৃষ্ট গানকেই আমরা গণসংগীত বলে থাকি।"[৪]

এই সমস্ত বক্তব্য একত্রিত করে তার ভিতর থেকে 'গণসংগীত' এর বিশেষত্ব খুঁজে বের করে সাজিয়ে দেওয়া গেল-

- অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ এ গানের প্রাথমিক শর্ত। এ অন্যায় ক্ষমতাশালী মানুষের দ্বারা ক্ষমতাহীনের প্রতি অন্যায়।

- তবে সেই প্রতিবাদটুকু দেখিয়েই এ গানের ভূমিকা শেষ হয়ে যায় না, নিরন্তর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে এমন এক নতুন দিন আসবে, যেদিন এই অপমান, অবহেলা, অত্যাচার, অন্যায়ের সুযোগ আর কেউ পাবে না- এই আশাবাদেও পৌঁছে দেয় আমাদের 'গণসংগীত'।

- সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব থেকে যেহেতু দুর্বলকে শোষণের ইচ্ছা জাগে, তাই সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতাও 'গণসংগীত' এর এক লক্ষ্য।

- 'গণসংগীত' দেশ, কালের বেড়ায় আবদ্ধ নয় কোনদিনই। যেহেতু সারা পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে শোষক-শোষিতের লড়াই চলেছে, চলছে, সে লড়াইয়ের চরিত্র সর্বত্র এক বলেই, সেই লড়াইগুলি থেকে উঠে আসা গান কোন বিশেষ দেশের নয়, কোন বিশেষ কালের নয়- আন্তর্জাতিক, কালোত্তীর্ণ; উচ্চমানের 'গণসংগীত' এর এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

'ভূমিকা' অংশে এ কথা খেয়াল করিয়ে দেওয়া দরকার, আমাদের এই গবেষণার কাজ বাংলা গণসংগীত নিয়ে। সময়পর্ব ১৯৪০-১৯৯০, এই পাঁচটি দশক। পৃথিবীর অনেক দেশেই এর আগে গণসংগীত লেখা হয়েছে, সে দেশগুলিতে বিপ্লব আগে সংঘটিত হয়েছে বলেই। পল্ রোবসন তেমনই এক বিপ্লবী। ধর্ম, জাতি, বর্ণভিত্তিক যে নিপীড়ন চলে মানুষের ওপর সারা দুনিয়ায়, তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রতাপশালী নিগ্রো কণ্ঠস্বর পল্ রোবসনের। তাঁর আত্মজীবনীর এই অংশটি তুলে দেওয়া এখানে খুব অপ্রাসঙ্গিক বোধ হয় হবে না-

> আর কতদিন, হে ঈশ্বর, আর কতদিন? নিপীড়িত মানুষের সেই বহুযুগের আর্তনাদ আজকাল প্রায়ই নিগ্রো কাগজে প্রতিধ্বনিত হয়, যার পাতায় পাতায় থাকে আমাদের ওপর নানান আক্রমণের খবর ও ছবি। একটি ছবিতে একজন নিগ্রোকে শ্বেতাঙ্গ লাথি মারছে আর সঙ্গে সঙ্গে আঘাতটা পাঠকের বুকে এসে লাগে। এছাড়াও আরো ভয়ংকর ছবি থাকে- জ্বলন্ত ক্রুশ, প্রহৃত পুরোহিত, বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল, শিশুদের প্রতি হুমকি, হাত-পা ভাঙা মানুষ, কারারুদ্ধ মা, অবরুদ্ধ পরিবার- এ সবই বলে দেয় কী চলছে চারপাশে।
>
> আর কত দিন? উত্তর : যতদিন আমরা সয়ে যাব। আমি বলি নিগ্রোদের আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নিতে পারে, আমি বলি এই সন্ত্রাস বন্ধ করা এবং সারা দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা আনার ক্ষমতা আমাদের আছে। এ ঘটনা স্বীকার করলেই আমাদের কর্মসূচি পরিকল্পনায় নতুন শক্তি, বলিষ্ঠতা ও সংকল্প আসবে, লক্ষ্যপূরণে আসবে নতুন জঙ্গিভাব।[৫]

এই তেজের কথা, এই আত্মবিশ্বাসের কথা বাংলায় লিখলেন কমল সরকার, মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল সে গান- "ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না/ নিগ্রো ভাই আমার পল্ রোবসন/ আমরা আমাদের গান গাই, ওরা চায় না, চায় না/ নিগ্রো ভাই আমার পল্ রোবসন/ ওরা ভয় পেয়েছে রোবসন/ আমাদের দৃপ্তকণ্ঠে ভয় পেয়েছে/ আমাদের রক্তচোখে ভয় পেয়েছে/ আমাদের কুচকাওয়াজে ভয় পেয়েছে, রোবসন/ ওরা বিপ্লবের ডম্বরুতে ভয় পেয়েছে- রোবসন/ নিগ্রো ভাই আমার পল্ রোবসন..." বাংলা গণসংগীত এটি, যার বিষয় আন্তর্জাতিক। পল্ রোবসনের পর তাঁরই দেখানো পথ ধরে এসেছেন পিট সিগার, বব ডিলান, জোয়ান বায়েজরা। বিভিন্ন সময়ে বাংলা গণসংগীতকারদের অনেকের কাছেই এঁরা হয়েছেন অনুপ্রেরণাস্বরূপ। পিট সিগারের কণ্ঠে বিখ্যাত হওয়া "উই শ্যাল ওভারকাম" এর হেমাঙ্গ বিশ্বাসকৃত অনুবাদ "আমরা করব জয়" এক্ষেত্রে মনে পড়ার কথা। বব ডিলান, জোয়ান বায়েজ-এঁরা তো অনেক পরের, রোবসন বা সিগারের প্রতিবাদের সুর, বা পৃথিবীর সকল দেশে যত নিপীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষ- তাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলবার সুর হঠাৎ করে একদিন বাংলা গানকে এসে কিন্তু বলেনি, কেন সে 'তুমি-আমি'র মধ্যেই আটকে আছে, বা এবার কিছু 'নতুন' হয়ে যাক! বাংলায় 'গণসংগীত' এই ফর্মটির জন্মের জন্য প্রয়োজন হয়েছে উপযুক্ত রাজনৈতিক, সামাজিক পটভূমির।

উত্তপ্ত চল্লিশের একদিকে বিশ্বযুদ্ধের ছোঁয়াচ, অন্যদিকে স্বাধীনতা আন্দোলন, দাঙ্গা, মহামারী, এসব দেখে-শুনে মানুষ যখন বিভ্রান্ত, বিধ্বস্ত, অসহায় তখন প্রগতি লেখক সংঘ, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের মূল চেষ্টা হয়ে ওঠে জ্বলজ্যান্ত বাস্তবকে ফুটিয়ে তুলে নাটক ও অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের রচনা। নাটকে, নাচে, গানে, কবিতায় দুর্বলের মনোবেদনা, তার প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ছবি সামনে এনে মানুষের মুক্তি ও শ্রেণীহীন সমাজগঠনের লক্ষ্যে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র সাংস্কৃতিক শাখা হিসেবে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' সেদিন থেকেই নিজের রূপ পেতে শুরু করে। ভারতীয় সংস্কৃতি শতবর্ষব্যাপী যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সুরে বাঁধা ছিল, সেখানে ব্যাপক পরিবর্তনঘটিয়ে 'গণনাট্য আন্দোলন' নিয়ে আসে সর্বহারা জাতীয়তাবাদের প্রেরণা। বলা বাহুল্য, সমাজ সচেতন লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীর এক বিশেষ অংশের সঙ্গে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের

অগ্রনী অংশের সহযোগিতার ফলেই তা বাস্তবে রূপ পায়। সেই শুরু গণনাট্যের অন্যতম সহযোগী হিসেবে গণসংগীতেরও পথচলার। একেবারে গোড়াতেই গণসংগীতকে যে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তার প্রমাণ, '৪৪ এই(প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যে), কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে যে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন 'গণণাট্য সংঘ' করে, তার প্রধান অংশই ছিল বিনয় রায়ের নেতৃত্বে দশটি জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে গণসংগীতের অনুষ্ঠান। এরাজ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংগ্রামী চেতনার ধারাবাহিকতা ও উত্তরাধিকার বহন ক'রে পরপর দুটি দশক জুড়ে নিজের ভিত শক্ত করেছে গণসংগীত।

আমাদের গবেষণাসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পর্বে 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রতিষ্ঠা, তার সূত্র ধরে 'প্রগতি লেখক সংঘ' ও 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' এর জন্ম, এবং পরেপরেই 'গণনাট্যে'র উদ্ভব, সঙ্গে 'গণসংগীত' নামে নতুন একধরণের গানের সঙ্গে বাঙালির পরিচয়- এই ইতিহাসের দিকটি তুলে ধরা হবে।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে দেখানো হবে, সাংগীতিকভাবে যে গণসংগীত ছিলই পূর্ববর্তী বাংলা গানে, সেইটি। চল্লিশের দশকে তার যে ফর্ম, হয়তো সেই ফর্মে নয়, কিন্তু বক্তব্যের দিক দিয়ে বিদ্রোহী গান আমরা আগেও দেখেছি। এ বিষয়ে প্রধান হোতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো/ একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো', কিংবা 'বিপুল তরঙ্গ রে/ সব গগন উদ্বেলিয়া, মগন করি অতীত অনাগত/ আলোকে উজ্জ্বল, জীবনে চঞ্চল এ কী আনন্দতরঙ্গ' বা এমন অজস্র গান, গণসঙ্গীতের যে মেজাজ, সেই মেজাজকে ছুঁয়েছে বহুদিন আগেই। কে বলবেন একথা জোর দিয়ে, পূজা পর্যায়ের 'এই কথাটা ধরে রাখিস- মুক্তি তোরে পেতেই হবে/ যে পথ গেছে পারের পানে, সে পথে তোর যেতেই হবে' একটি সার্থক গণসংগীত নয়? কিংবা এই পংক্তি ক'খানি, 'আকাশ হতে প্রভাত-আলো আমার পানে হাত বাড়ালো/ ভাঙা কারার দ্বারে আমার জয়ধ্বনি উঠল রে, এই উঠল রে'? গণনাট্যের মঞ্চে এককালে বহু রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্ররা প্রমাণ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের গান রয়েছে যেমন প্রেমে, যেমন সংযমে, যেমন নিবেদনে, যেমন পূজায়, তেমনি

মুক্তিআকাঙক্ষায়ও। রবীন্দ্রনাথের এই মুক্তিআকাঙ্ক্ষাকামী গানগুলির খোঁজ আমাদের আলোচনার এই পর্বে রইবে। রবীন্দ্রনাথের গানের পাশাপাশি, এমনকি, বাংলা গানে আরো আগে থেকে চলেছে স্বদেশী গানের ধারা। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনমোহন বসু, রবীন্দ্রনাথ নিজে, তারপর দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ- এঁরা সকলে সেই গানের প্রবাহে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। পরাধীনতার শৃঙ্খল ঘুচিয়ে দেশের মানুষকে দিতে হবে মুক্তির স্বাদ- এই লক্ষ্য নিয়েই স্বদেশী গান লিখেছেন প্রত্যেকে। গণসংগীতও একশ্রেণির মানুষের মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করে বলেই খেয়াল করা যায়, সমালোচকরা স্বদেশী গানগুলিতেই মেনে থাকেন 'গণসংগীত' এর সম্ভাবনা।

নজরুল এঁদের মধ্যে থেকেও ব্যতিক্রম। নজরুলের ভাষাব্যবহারে লক্ষ্য করা যায় রীতিমত ভয় দেখানোর কৌশল। 'লাথি মার্, ভাঙ্ রে তালা/ যত সব বন্দীশালায় আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা ফেল উপাড়ি'-এভাবেই ঠিক লিখে চলেন নজরুল। কার্যত তাঁরই হাতে, কীভাবে বাংলা 'গণসংগীত' জন্মলাভ করে, কী কী সেই গানগুলি-তার বিস্তৃত বর্ণনাও রাখা হবে আলোচ্য পর্বে।

নির্বাচিত গণসংগীত রচয়িতাদের পরিচয়, তাঁদের লেখালেখির পরিচয় দেওয়া হবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। নির্বাচিত, কারণ আমাদের নির্ধারিত সময়পর্বের সমস্ত গীতিকারদের নিয়ে আলোচনা এই ছোট গবেষণার কাজে অসম্ভব, তাই। যাঁদের নির্বাচন করা হয়েছে, কেন তাঁদেরই বাছা হল, সে যুক্তি উক্ত অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হবে। জীবনের শেষপর্বে পৌঁছে দেবব্রত বিশ্বাস বারবার এই বলে আক্ষেপ করতেন, গণনাট্যের উত্তাল সময়ে শহরের মানুষের কাছেই তিনি কেবল পৌঁছতে পেরেছিলেন কারণ, সলিল, হেমাঙ্গর গান তিনি গাইলেও, অধিকাংশ সময়েই গাইতেন রবীন্দ্রনাথের গান; গ্রামে গ্রাম্য সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে তাদের মত করে গান গাইবার উপযুক্ত তিনি ছিলেন না কখনো। এ তাঁর ব্যর্থতা যেমন, গণনাট্যেরও ব্যর্থতা। গণসংগীতের দুনিয়ায় দুই দিকপাল সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস সকলের পরিচিত, সকলের ভালোবাসার জন। এঁদের ভিতরকার দ্বন্দ্বও মূলত এই জায়গাতেই। বাংলা গণসংগীত মানুষের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা, কাজেই, তাকে

উপস্থাপন করার জন্য দরকার নতুন ফর্ম, নতুন সুরের কাঠামো- এই ছিল সলিলের মত। তাই তিনি করলেন। করতে গিয়ে সাহায্য নিলেন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের, তাঁর গানগুলি সাহিত্য হিসেবেও যেহেতু উৎকৃষ্ট, সবে মিলে সাফল্য এল প্রভূত। কিন্তু এই সাফল্য এনে দিলেন কারা? অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ইনটেলেকচুয়াল! গ্রামের লোকের কাছে বরাবর আপন কিন্তু কৃষকের ছেলে নিবারণ পণ্ডিত, বিড়ি শ্রমিক গুরুদাস পাল- এঁরা। এঁরা যে প্রতিবাদের গানও বাঁধতেন গেঁয়ো সুরে; কখনো চটকার সুরে, কখনো কবিগানের মত, কখনো বাউল সুরে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসও কিন্তু চেয়েছিলেন লোকসঙ্গীতের সুরকে আশ্রয় করেই গান তৈরি করতে, যাতে গ্রামের মানুষের যন্ত্রণার কথা তাদেরই চেনা সুরে ব'লে, অনেক বেশি সংখ্যক মানুষকে আন্দোলনমুখী করে তোলা যায়। কাজেই খেয়াল রাখতে হবে জনপ্রিয়তার মাপকাঠি সবসময়েই আপেক্ষিক। কার গান সফল, কার গান নয়, সে কথা বলার বা বিচার করার অধিকার শহরের শিক্ষিত লোকেদের নয় শুধু। যাঁদের জন্য আন্দোলন, বিচার তাঁরাও করবে। তাঁদেরই বিচারে আমাদের মধ্যবিত্তের পছন্দের গণসংগীত রচয়িতাদের তালিকার ক্রম অদল বদল হয়ে যেতেই পারে- মূলত এই কথাটিই বলতে চাওয়া হবে আলোচ্য অধ্যায়ে।

আলোচনার তৃতীয় অধ্যায়ে থাকবে সেই গানগুলির খোঁজ 'আধুনিক বাংলা গান' হয়েও যেগুলির ওপর গণসংগীতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি রেকর্ডের গানও হতে পারে, আবার হতে পারে ছায়াছবির গানও। 'আধুনিক বাংলা গান' এর 'কথা' বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই ভীষণ প্রচলিত। আমাদের আলোচনায় তুলে আনা এই অধ্যায়ের গানগুলি সেই বিদ্রূপের জবাব হতে পারবে। হীরেন বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলেন রায়, অজয় ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ, প্রণব রায়, মোহিনী চৌধুরী, শ্যামল গুপ্ত, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুধীন দাশগুপ্ত, পরেশ ধর প্রমুখের গানে অজস্র উদাহরণ এমন ছড়িয়ে আছে, যা প্রমাণ করে এমন অনেক গানই ছিল যেগুলি ফুল-পাখি-চাঁদ-তারা-তুমি-আমির বাইরে। প্রসঙ্গত আলোচনায় আসবেন গীতিকার সত্যজিৎ রায়, কিছু পরের জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের মত সমাজ সচেতন গীতিকার এবং তাঁরই উত্তরসূরী হিসেবে কবীর সুমন।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের ‘পরিশিষ্ট’ অংশে রাখা হবে বিশিষ্ট গায়ক, সংগ্রাহক ও গণসংগীত রচয়িতা শুভেন্দু মাইতির একটি সাক্ষাৎকার।

সূত্রনির্দেশ :

১. রুদ্র সুব্রত (সম্পা.), “ভূমিকা”, *গণসংগীত সংগ্রহ*, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯০

২. বিশ্বাস হেমাঙ্গ, “সত্তর দশক ও গণসংগীত”, আচার্য অনিল (সম্পা.), *সত্তর দশক-খণ্ড দুই*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৭০

৩. ভট্টাচার্য রত্না, “গণসংগীত”, ঘোষ প্রদীপকুমার (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা* ৬, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৬৪

৪. সেনগুপ্ত দিলীপ, “গণনাট্য আন্দোলন ও বাংলা গানের ধারা- একটি সমীক্ষা”, ঘোষ প্রদীপকুমার (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা* ৭, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২২৪

৫. রোবসন পল্, *যে পথে দাঁড়িয়ে*, চক্রবর্তী দীপেন্দু (অনু.), অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৮৯

বাংলা গণসংগীতের উৎস সন্ধানে

- অনুসন্ধান : এক (ইতিহাস নির্ভর)

'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' আর 'গণসংগীত' এর সম্পর্ক গুরুতর। চল্লিশের দশকের বাংলায় রাজনৈতিক ডামাডোল যখন মানুষের প্রতিদিনের বেঁচে থাকাকে ক্লেদাক্ত করে তুলেছে, সেই সময় সাংস্কৃতিক উপায়ে মানুষের চেতনাশুদ্ধি ও সুচেতনা নির্মাণের জন্য গড়ে ওঠে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'। একদিনে 'গণনাট্য সংঘ' গড়ে ওঠেনি। তার আবির্ভাবের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেছিল 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি'।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা

আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী আন্দোলনের পাশাপাশি সাম্যবাদী ভাবনার সূচনা, সমাজতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ মূলত শুরু হয় ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরপরই। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯২০ এর ১৭ ই অক্টোবর রাশিয়ার তাসখন্দে কয়েকজন ভারতীয় মিলে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন। দলের প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন- মানবেন্দ্রনাথ রায়, ইভলিন ট্রেন্ট রায় (মানবেন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রী), অবনী মুখোপাধ্যায়, রোজা ফিটিনগফ (অবনী মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী), মহম্মদ আলী, মহম্মদ শাফিক সিদ্দিকি, রফিক আহমেদ, এম.পি.বি.টি আচার্য ও আহমেদ খান তারিন। এরপর ১৯২৫ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর কানপুরে একটি কমিউনিস্ট কনফারেন্সের আয়োজন করা হয় (যদিও পরে কনফারেন্সের স্থান পরিবর্তন করা হয়)। এই কনফারেন্সেই 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি' নামটি গৃহীত হয়। বিশ শতকের গোটা দ্বিতীয় দশক জুড়ে দলের সংগঠন খুব স্বাভাবিকভাবেই ছিল নড়বড়ে। ইতিউতি কিছু বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। তারই প্রেক্ষিতে পার্টির অধীনস্থ অনেককে 'সন্ত্রাসবাদী' তকমা দিয়ে ব্রিটিশ সরকার জেলে পাঠাতে থাকে। বলাই বাহুল্য এই তরুণদল মার্কসবাদী চিন্তাভাবনায় ভাবিত হচ্ছিলেন, মার্ক্স- এঙ্গেলসের বই পড়ছিলেন, সোভিয়েত রাশিয়ায় কমরেড লেনিনের

অভ্যুত্থানের ইতিহাস পড়ছিলেন, সারা পৃথিবীর মেহনতি মানুষের ইতিহাস সংগ্রহ করছিলেন- আর এগুলিই ছিল তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ! প্রসঙ্গত এসে পড়বে এখানে 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা'র কথা। ১৯২৯ সালের ২০ শে মার্চ সারা দেশে খানাতল্লাশী চালিয়ে ব্রিটিশ সরকার ৩১ জন কমিউনিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়নিস্টকে গ্রেপ্তার করে। সরকারি পক্ষের প্রধান কৌঁশুলি, ব্যারিস্টার ল্যাঙ্গফোর্ড জেমস তাঁর প্রথম বক্তৃতায় বলেন যে, তিনি প্রমাণ করবেন 'কমিউনিস্টরা ধর্মবিরোধী, জাতীয়তা বিরোধী, সমাজে যা কিছু শিষ্ট আর ভব্য তার সব কিছুরই বিরোধী।' তাঁর লক্ষ্য ছিল এটা প্রতিপন্ন করে তিনি কমিউনিস্টদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলবেন সবরকম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহায়তা থেকে। কিন্তু ফল ফলে সম্পূর্ণ বিপরীত! দায়রা আদালত আসামীদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেও সাড়ে চার বছর মামলা চালানোর পর ১৯৩৩ এর আগস্টে দেখা যায় হাইকোর্ট এমনভাবে আসামীদের দণ্ড হ্রাস করেছেন যে তাঁদের অধিকাংশকে সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি দিতে হয়। বাকিদের বড়জোর আর কিছুদিন জেল খাটতে হয়। তাছাড়া 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা'র আসামীদের সমর্থনে দেশে বিদেশে বিরাট আন্দোলন শুরু হয়। লাভের লাভ কমিউনিস্টদেরই হয়, একটু ঘুরপথে! আত্মপক্ষ সমর্থন করে আসামীরা আদালতে যে বিবৃতি দেন দিনের পর দিন, সংবাদপত্র মারফত সেগুলি দেশের তরুণদের কমিউনিজম এ উজ্জীবিত করতে থাকে। ওই বছরই(১৯২৯) জুলাই-আগস্ট মাসে ডঃ প্রভাবতী দাসগুপ্তার নেতৃত্বে 'বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' এর পরিচালনায় শ্রমের ঘন্টা ও কাজের চাপ বাড়ানো, দু শিফটের জায়গায় এক শিফট চালু করে ৬০,০০০ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরোধিতা করে চটকল শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করেন। ধর্মঘট শুরু হয় আলমবাজার ও বরাহনগর থেকে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে তাতে যোগদান করেন বরাহনগর থেকে ব্যারাকপুর অবধি প্রায় এক লক্ষ চটকল শ্রমিক। বলাই বাহুল্য, এই শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্টরা বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। আব্দুল মোমিন, আব্দুর রেজ্জাক খাঁ, কালী সেন, বঙ্কিম মুখার্জি, মণি সিং প্রমুখের নাম এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। চটকল মালিকেরা শ্রমিকদের কিছু দাবি মেনেছিলেন, কিছু মানেননি; তা সত্ত্বেও ১৯২৯ এর চটকল শ্রমিকদের ঐ সাধারণ ধর্মঘট ঐতিহাসিক, কারণ লক্ষ লক্ষ চটকল শ্রমিক সেই প্রথম সচেতন হয়েছিল ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের গুরুত্ব সম্বন্ধে। এরকম আরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তার বিপ্লবী চরিত্র সুগঠিত করতে থাকে ধীরে ধীরে। তেমনই আরেকটি ঘটনা কিশোরগঞ্জের কৃষক অভ্যুত্থান। সময়টা ১৯৩০, মে-জুন মাস। কিশোরগঞ্জের ১০ মাইল দূরে এক গ্রামে এক অত্যাচারী মুসলমান মহাজনের বাড়ির ওপর হামলা চালায় হিন্দু-

মুসলমান কৃষক মিলিতভাবে। তার কাছাড়িবাড়ি তছনছ করে জ্বালিয়ে দেয়। কাছাকাছি জাঙ্গালিয়া, হোসেনপুর, মঠখোলা, গোবিন্দপুর থেকে কাতারে কাতারে কৃষক এসে আন্দোলনকে বৃহৎ আকার দেয়। জমির দখল প্রত্যাশা করলে জাঙ্গালিয়ার অত্যাচারী মহাজন কৃষ্ণ রায় উত্তেজিত কৃষকের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়, আট জন কৃষক নিহত আর বহুজন আহত হয়। ঘটনার এখানেই ইতি ঘটেনি। ক্ষিপ্ত জনতা কৃষ্ণ রায়ের বাড়ির দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে তাকে হত্যা করে। ইংরেজ সরকার এবং জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি এই প্রচার চালায় যে, ঐ হাঙ্গামা সাম্প্রদায়িক এবং কঠোর হাতে তা দমন করা দরকার। একমাত্র কমিউনিস্টরা এই গণজাগরণ সমর্থন করেন, কৃষকদের পাশে দাঁড়ান। একই বছর, এপ্রিল মাস। দুপুরবেলা মোষের গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ করে আইন তৈরি করে পুলিশ, তার প্রতিবাদে পয়লা এপ্রিল কলকাতায় মোষের গাড়ির গাড়োয়ানরা তাঁদের গাড়ি থেকে মোষ খুলে পরপর গাড়িগুলি সাজিয়ে শিয়ালদা স্টেশন থেকে হাওড়া স্টেশন অবধি গোটা হ্যারিসন রোড অবরোধ করে। পুলিশের সঙ্গে ব্যারিকেড সংগ্রাম চালায়। পুলিশের গুলিতে সেদিন পাঁচজন গাড়োয়ান সমেত সাতজনের মৃত্যু হয়। খুব স্বাভাবিকভাবে এই আন্দোলনের পিছনেও প্ররোচনা ছিল কমিউনিস্টদের। আন্দোলনকে সমর্থন কেবল না, উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে আব্দুল হালীম এক ইস্তেহার প্রকাশ করে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন! এরকম বহু ঘটনার উল্লেখ করে দেখান যেতে পারে যেখানে পার্টির সংগ্রামী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে বারবার। এটা পার্টির হাতেকলমে ক্রিয়াশীল থাকবার দিক। আরেকটা দিক ছিল, যা মানুষের মননের সঙ্গে যুক্ত। স্পষ্টত ব্যাপারটা এরকম- এতদিন মানুষ সাহিত্য, শিল্প রচনা করেছে ব্যক্তিগত অনুভবকে প্রাধান্য দিয়ে, তাতে কল্পনার রঙ মিশিয়ে। সেই রসবিলাস আজকের যুগে অসাড় মনে হল কমিউনিস্টদের, যেখানে সংগ্রামের পর সংগ্রাম করে চলেছে মানুষ কেবল মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার প্রত্যাশায়। এই নতুন ভাবনাকে সাথী করে সেই সাহিত্য, সেই শিল্প রচনায় ব্রতী হলেন তাঁরা, যাঁরা জাতিকে পথ দেখাবে, তার মুক্তির কথা ঘোষণা করবে। গড়ে উঠল ‘প্রগতি লেখক সংঘ’। আগে দেশ দেখেছে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের সংগঠন। এবার দেখল লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন।

প্রগতি লেখক সংঘ

১৯৩৬ এ লখনউয়ে সারা দেশ থেকে সমবেত লেখক-বুদ্ধিজীবী-শিল্পীদের নিয়ে ১০ই এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ'। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত হিন্দীভাষী লেখক মুন্সি প্রেমচন্দ। সংগঠন গঠিত হওয়ার পর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন মুন্সি প্রেমচন্দ এবং প্রথম সম্পাদক হন সজ্জাদ জহীর। এর ছয় মাসের মধ্যে এই সংঘের এগারোটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়, কলকাতা, বোম্বাই, দেরাদুন, এলাহাবাদ, লখনউ, আলিগড়, দিল্লি, লাহোর, ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি অঞ্চলে। কলকাতায় প্রতিষ্ঠা ১১ই জুলাই। প্রতিষ্ঠা পাবার কয়েকমাস আগে ১৯৩৫ এর নভেম্বরে লন্ডনের ডেনমার্ক স্ট্রীটের নানকিং চাইনিজ রেস্তোরাঁয় ভারত ও ব্রিটেনের লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা এক সমাবেশে মিলিত হয়ে প্রগতি লেখক সংঘের প্রাথমিক রূপ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, আর সেদিনই দীর্ঘ আলোচনা শেষে প্রস্তুত হয়েছিল সংঘের ইস্তেহার, যে ইস্তেহারে বলা হয়েছিল-

We believe that the new literature of India must deal with the basic problem of hunger and poverty, social backwardness and political subjection.

এই ইস্তেহারে আরো বলা হয়েছিল, এই নতুন সাহিত্যভাবনা থেকে যেসব শিল্পী-সাহিত্যিক দূরে সরে থাকতে চাইবেন, তাঁরা পরিত্যক্ত হবেন; আর এই ভাবনার শরিক হয়ে যারা শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি করবেন, তাঁরাই প্রগতিবাদী আর এখানেই এই আন্দোলনের নামকরণের সার্থকতা।

বিভিন্ন সময়ে নানা নামে প্রগতি লেখক সংঘের রূপান্তর ঘটেছে। লন্ডনে ব্রিটিশ-ভারতীয় বুদ্ধিজীবী-লেখক-শিল্পীরা মিলে সংঘ প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তখন নাম ঠিক করা হয়েছিল 'প্রগতি সাহিত্য সংঘ'। পরে ইস্তেহার প্রকাশের সময় নাম পালটে রাখা হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ'। আর লখনউ এ আনুষ্ঠানিকভাবে সংঘ প্রতিষ্ঠার সময় নামকরণ হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'। এই নাম পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে শেষ অবধি কী দাঁড়িয়েছিল, আমাদের আলোচনার প্রয়োজনেই সেই জায়গায় আমাদের যেতে হবে।

এ কথা অবিসংবাদিত যে, মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় উদ্যোগেই এদেশে প্রগতি লেখক সংঘ গড়ে ওঠে। ইওরোপ প্রত্যাগত মার্কসবাদে দীক্ষিত হীরেন মুখোপাধ্যায়, সজ্জাদ জহীর, ভবানী ভট্টাচার্য, ইকবাল সিং, রাজা রাও, মুহম্মদ আশরাফ প্রমুখের সচেতন প্রচেষ্টা এর পিছনে কার্যকরী ছিল।

'৩৬ এ প্রথম সম্মেলনের পর, এই সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন হয় কলকাতার আশুতোষ কলেজে (১৯৩৮), তৃতীয়টি ১৯৪৩ এ বোম্বাইয়ে, চতুর্থটি ১৯৪৯ এ, ফের কলকাতায়। '৩৮ এর দ্বিতীয় সম্মেলন, যা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং বঙ্গদেশের সংস্কৃতি আন্দোলনে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল, সেইবার সংঘে যোগ দিয়েছিলেন সরোজ দত্ত, বিনয় ঘোষ, সমর সেন, গোপাল হালদার, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা। আর কলকাতাতেই আয়োজিত চতুর্থ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল 'গণসংগ্রামে যোগদান ছাড়া সমাজের তথা সাহিত্যের মুক্তি নেই'। ঠিক এই বাক্যটিকেই প্রগতি আন্দোলনের চালিকাশক্তি ধরে নেওয়া যেতে পারে।

ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ

ত্রিশের দশক থেকেই জার্মানি, ইতালি, স্পেন, জাপান, গ্রিসে ফ্যাসিস্ট শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। জার্মানিতে হিটলার, ইতলিতে মুসোলিনি, জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো, গ্রিসের রাজা, স্পেনের জেনারেল ফ্রাঙ্কো সেখানকার রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে চলছিলেন, ফলত ঐসব দেশে গণতন্ত্র এগোচ্ছিল বিলুপ্তির পথে। তাদের উগ্র সাম্রাজ্যলিপ্সা ও যুদ্ধোন্মাদনা গোটা ইওরোপে খুবই অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠছিল। জীবনযাত্রায় স্বাধীনতা তাদের ফুরোতে বসেছিল, তাই নয় কেবল, শিল্প সাহিত্যেরও কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল। গণতন্ত্রকে বাঁচাবার, সঙ্গে শিল্প সাহিত্যকে রক্ষা করার দায়িত্বে গণতান্ত্রিকচেতনাযুক্ত মানুষেরা এক হতে লাগলেন, সারা পৃথিবী জুড়ে শুরু হল তোড়জোড়।

ইতালির আবিসিনিয়া দখল, ফ্রাঙ্কোর স্পেন দখল, হিটলারের ফ্রান্স দখল, জাপানের চীন আক্রমণ দেখে বুদ্ধিজীবীরা চিন্তিত হলেন। এই পরিস্থিতিতে আইনস্টাইন, রঁমা রলাঁ, গোর্কি, বার্নার্ড শ, আনাতোল ফ্রাঁস, স্টিফান জ্যুইগ, প্রমুখ বৈজ্ঞানিক-চিন্তাশীল লেখক-শিল্পীর দল নানাভাবে সংগঠিত ও মিলিত হচ্ছিলেন। এইভাবে ১৯৩৩ এর জুন মাসে প্যারিসে 'অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট ওয়াকার্স কংগ্রেস' গঠিত হল। এঁরা সবাই ১৯৩৫ এর ২১ জুন প্যারিসে ফের কনফারেন্সের আয়োজন করলেন আর সেটাই হল নানা দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ভারত থেকে মুলকরাজ আনন্দ উপস্থিত ছিলেন সেখানে।

জার্মানিতে ফ্যাসিস্ট হিটলার ও তার নাৎসিবাহিনী স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার মতলবে পৃথিবীর তাবৎ চিন্তাশীল মণীষীদের বইগুলি পুড়িয়ে নষ্ট করার উৎসবে মেতে উঠলে রমাঁ রলাঁ খেয়াল করিয়ে দেন, পুড়ে যাওয়া বইগুলি স্টালিন, গোর্কি বা রেনের মত জার্মান মজুরদের লেখা বইই নয় শুধু, পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত মানবপ্রেমিকদের রচনাও বটে। যে সকল শিল্পী-লেখকেরা ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রামে যোগ দিতে মনস্থির করেননি তখনো, রলাঁ তাঁদের এটাই বোঝাতে চাইছিলেন, নিভৃত সাধক লেখক-শিল্পীকেও ফ্যাসিস্টরা ছেড়ে কথা বলবে না। তাই রলাঁ, গোর্কি, আঁরি বারবুস প্রমুখ সারা দুনিয়ার বিবেকবান, মানবমুক্তিকামী শিল্পী সাহিত্যিকের কাছে আহ্বান জানালেন ফ্যাসিজমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার।

ভারতে ব্যাপারটা ঘটল এইরকম-

১৯৪২ এর ৮ই মার্চ। অবিভক্ত বাংলার ঢাকায় তরুণ লেখক ও সংগঠক সোমেন চন্দ প্রকাশ্য দিবালোকে একটি বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনা করে এগোচ্ছিলেন। এই আন্দোলন ভেস্তে দেওয়ার জন্য দক্ষিণপন্থী ও ফ্যাসিস্ট চক্রান্তকারীরা মিছিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিরস্ত্র আর অহিংস মিছিলের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। ফ্যাসিস্ট গুন্ডাদের হাতে সোমেন চন্দ প্রাণ হারান। কলকাতার প্রগতিবাদী শিল্পী সাহিত্যিকরা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে একত্রিত হন ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের লাইব্রেরি হলে, ২৯ এ মার্চ। সেখানেই তাৎক্ষণিক আলোচনার ভিত্তিতে 'প্রগতি লেখক সংঘ' 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' এই পরিবর্তিত নামে পরিচিত হয়। এই সংঘের সঙ্গে যুক্ত থাকেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আবু সৈয়দ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, যামিনী রায়, অমিয় চক্রবর্তী, হিরণ সান্যাল, অমিয় চক্রবর্তী, সজনীকান্ত

দাসেরা। নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের বাংলা শাখা হিসেবে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের নেতৃত্ব দেয় কমিউনিস্ট পার্টিই, বলা বাহুল্য। পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন থেকে সংগীত শিল্পী বিনয় রায়, 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা থেকে সুধী প্রধান, চিন্মোহন সেহানবীশ, সাহিত্যিক হিসেবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অনিল কাঞ্জিলাল- এঁদের জড়ো করেই প্রথমে পার্টির একটি প্রাদেশিক সাংস্কৃতিক ইউনিট গড়া হয়, পরে মুক্তিকামী ও জীবনমুখী এই নব সংস্কৃতি আন্দোলনে নাম লেখান বহু লেখক, শিল্পী।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বহুমুখী করে তোলার জন্য এই সংঘের অধীনে কয়েকটি 'সেল' তৈরি করা হয়। যেমন গণনাট্য সেল, লেখক ও সাংবাদিক সেল, পরিচয়(১৯৪৩ থেকে পার্টি 'পরিচয়' পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করে) সেল, চিত্রশিল্পী সেল, অগ্রণী সেল প্রভৃতি। একেকটি সেলের দায়িত্ব উপযুক্ত একেকজন ব্যক্তিকে দিয়ে যথেষ্ট সুগঠিতভাবে কাজ করতে থাকে এই সংঘ। ফ্যাসিস্ট আক্রমণে বিধ্বস্ত শিল্প সংস্কৃতি রক্ষার মূল উদ্দেশ্য নিয়ে যে সম্মেলনগুলি হয় এঁদের, শহর কলকাতায়, প্রত্যাশার অনেক বেশি সাহল্য পায় সেগুলি।

যেমন দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। সভাপতি ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও গোলাম কুদ্দুস। সব জেলা থেকেই শতাধিক প্রতিনিধি যোগ দেন এতে। ছ'হাজার মানুষের উপস্থিতিতে জমে ওঠে অনুষ্ঠান। ১৯৪৩, ১৫-১৬ জানুয়ারি দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে যা কিছু দেখা যায়, শোনা যায়, তা হল : নিবারণ পন্ডিতের পাঁচালি গান, নির্মলেন্দু চৌধুরীর লোকগান, যশোরের কবিয়াল নেপাল সরকারের কবিগান, মালদার শিল্পী সতীশ মন্ডলের গম্ভীরা গান, রংপুরের অমূল্য সেন সম্প্রদায়ের কীর্তন; পানু পালের মহামারী নৃত্য, অনু দাশগুপ্তের চা-বাগিচা নৃত্য, বিনয় রায়ের 'ম্যায় ভুখা হুঁ' নৃত্যনাট্য। আর ১৭ ই জানুয়ারী মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয় বিখ্যাত 'জবানবন্দী' নাটক।

খেয়াল করা প্রয়োজন, ঐ বছরই বাংলায় শুরু হয়েছে মহামারী। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের সদস্যেরা নব উদ্যমে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। গল্পে- কবিতায়- নাটকে- গানে মানুষের মনে বাঁচার আশা জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করেন।

পঞ্চাশের মন্বন্তর

> ১৯৪৩ সাল বাংলাদেশের বুকে যে বিপর্যয় বহন করে এনেছে তার তুলনা বাংলাদেশের ইতিহাসে আর মেলেনা। আমরা এই বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে এখনও চলছি এবং যদি কখনও সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হতে পারি তাহলে তখন এর ভয়াবহতা হয়তো আরও বেশি করে উপল্লব্ধি করতে পারব।
>
> এ দেশে একবার মন্বন্তর ঘটেছিল, এবারে ঘটল মহামন্বন্তর। একদিকে পথে পথে ক্ষুধার্ত নরনারীর মিলিত আর্তনাদ, অন্যদিকে খবরের কাগজে সভায়- সমিতিতে তার প্রতিধ্বনি। চোখের সম্মুখে রাজপথের উপর লোক মরছে, পথে পথে মৃতদেহ পড়ে আছে, মা মৃতশিশুকে কোলে নিয়ে কাঁদছে, স্ত্রী স্বামীর মৃতদেহের পাশে কাঁদছে,...
>
> ব্যাপারটা এমনই কল্পনাতীত, এমনই আকস্মিক যে প্রথমে এ দৃশ্য চোখে দেখলেও কারও ঠিকমত বিশ্বাস হয়নি। প্রথমে এল গৃহ- সংসার ভেঙে দিয়ে পল্লীবাসীরা। এসে চালের দোকানের সম্মুখে 'কিউ' করে দাঁড়াল। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না,বসল। শেষে বসতেও পারল না, শুয়ে পড়ল। চব্বিশঘন্টা পথের ওপর অপেক্ষা করে থাকলে তবে কন্ট্রোলের দোকানে দুসের চাল মিলতেও পারে। রৌদ্রে বৃষ্টিতে পথের উপর পশুদলের মতো জীবন্মৃত নরনারীর ভিড় জমে গেল। যারা মরে গেলেও পথে বেরিয়ে আসতে পারেনি তাদের কী দুর্দশা হল তা জানা গেল না।[১]

বারোজন লেখকের বারোটি মন্বন্তর বিষয়ক ছোটগল্পের সম্পাদনা করে একটি বই প্রকাশের সময় পঞ্চাশের মন্বন্তর সম্বন্ধে এই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছিলেন পরিমল গোস্বামী। স্বল্প কথায় তাঁর বক্তব্য থেকে আমরা যারা সেই মন্বন্তর ভাগ্যবশতই প্রত্যক্ষ করিনি, তাদের ১৩৫০ বঙ্গাব্দের কলকাতা শহর সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণাটুকু স্পষ্ট হয়।

স্মরণে রাখতে হবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চতুর্থ বছর সেটা। ভয়াবহতা, উন্মাদনা, ব্যাপকতায় সারা বিশ্বের ইতিহাসকে চমকিত করেছে এই যুদ্ধ। ব্রিটিশের উপনিবেশ হিসেবে ভারতেও তাই এর আঁচ এসে লাগে। যুদ্ধের ব্ল্যাকআউট, ইংরেজ ও মার্কিন সৈন্যের আনাগোনা, অক্ষশক্তি হিসেবে ভারতের ওপর জাপানের আক্রমণ- বলাই বাহুল্য ভারতবাসীর উদ্বেগ বাড়িয়ে তোলে। শীঘ্রই জাপান ভারতের সিঙ্গাপুর আর বার্মার দখলও নেয়।

ভারতের উপর জাপানের হস্তক্ষেপে ভীত ইংরেজ ভারতের সর্ববৃহৎ ও প্রধান রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেসের সাহায্য প্রার্থনা করে এই বুঝে যে, এদের সাহায্য ছাড়া

এ দেশে ব্রিটিশ শাসন কায়েম রাখা অসম্ভব। জাতীয় কংগ্রেসও বুঝতে পারে, ভারতে ব্রিটিশ রয়েছে বলেই জাপান বিরোধী পক্ষ হিসেবে ভারত আক্রমণ করেছে। ১৯৪২ এর কংগ্রেস অধিবেশনে তাই 'ভারতছাড়ো আন্দোলন' এর প্রস্তাব পাশ হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ব্রিটিশ সরকার জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠনকে বেআইনি ঘোষণা করে আর প্রথম সারির সব নেতাকে গ্রেপ্তার করে। আন্দোলন কিন্তু ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে, তাল মিলিয়ে বাড়ে ব্রিটিশ সরকারের পীড়ন, অত্যাচার।

এর মধ্যে ভারতের বুকে জাপানের অপ্রতিহত আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য ব্রিটিশ সরকার এক পরিকল্পনা করে। ১৯৪২ এই 'ডিনাইয়াল পলিসি' নেয় তারা। এর মাধ্যমে জাপানি আক্রমণের আতঙ্কে আতঙ্কিত ব্রিটিশ সরকার ভারতের পূর্ব উপকূলের সীমান্তবর্তী ও সমুদ্রতীরবর্তী সমস্ত অঞ্চলের যানবাহন এবং বিশেষ করে নদী পথের যানগুলি যেমন নৌকা ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করে। দক্ষিণের সমস্ত সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে দশজন ও তার বেশি যাত্রীবাহী নৌকা সরিয়ে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। জাপানি সৈন্য ভারতে ঢুকে পড়লে যাতে যাতায়াতের সমস্যা হয়, তাই এই ব্যবস্থা। তাছাড়াও জাপানি সৈন্য এদেশে ঢুকে পড়ে যাতে খাদ্যরসদ জোগাড় করতে না পারে, তার জন্য ব্রিটিশ সরকার উপকূলবর্তী অঞ্চলের মানুষের থেকে ধান, চাল, অন্যান্য খাদ্যশস্য কেড়ে নেয়, প্রচুর শস্য নষ্ট করে ফেলে। আর জলযান বাজেয়াপ্ত করায় দরকারি খাদ্য নদীপথে সরবরাহ করার উপায়ও থাকে না।

ওদিকে ব্রিটিশরা যুদ্ধকালে প্রয়োজনীয় খাদ্যের জোগানের কথা ভেবে নিজেদের সৈন্যদের জন্য নানা অঞ্চল থেকে শস্য কেড়েকুড়ে মজুত করে রাখে।

পাশাপাশি জাপানি আক্রমণের কারণে রেঙ্গুন ইংরেজদের হাতছাড়া হওয়ায় রেঙ্গুন থেকে সাধারণ মানের যে প্রচুর চাল সস্তা দরে এদেশে আমদানি করে সাধারণ মানুষের খাদ্যের চাহিদা মেটানো হত, তাও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারত থেকে বাইরের দেশগুলিতে খাদ্যশস্য রপ্তানির যে ব্যবসা ব্রিটিশ এতদিন চালাচ্ছিল, তা অব্যাহতই থাকে।

এছাড়া যুদ্ধের জন্য, যুদ্ধ সংক্রান্ত নানা উপকরণ তৈরির প্রয়োজনে শিল্প কারখানা তৈরি হতে থাকে শহরে। গ্রামের বহু মানুষ, কৃষক, খেতমজুর চাষাবাদ ছেড়ে এইসব কারখানায় শ্রমিকের কাজে যোগ দেয়। কারণ অবশ্যই কাঁচাটাকা প্রাপ্তির লোভ। এর ফলে, কৃষিকাজে

পর্যাপ্ত লোক না মেলায় কৃষি উৎপাদন কমে যায়। তা ব্যতীত যতটুকু ফসল ফলেছিল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর পোকামাকড়ের উপদ্রবে তাও নষ্ট হয়।

পঞ্চাশের মন্বন্তর সংঘটিত হবার পিছনে উপরের কারণগুলিকে দায়ী ক'রে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে রিপোর্ট করেন বাংলা প্রাদেশিক সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী সুরাবর্দী। কিন্তু আসল কারণই সে রিপোর্টে বাদ পড়ে যায়, যা দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে পরে বোঝা গেছে। যাঁরা গবেষণা করেছেন, অমর্ত্য সেন তাঁদের অন্যতম।

ড. সেন ১৯৪০-৪১ থেকে ১৯৪৩- এই সময়ের বাংলায় ধান উৎপাদনের হার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ আলোচনা করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, ১৯৪৩ এ খাদ্যশস্যের সরবরাহ আগের পাঁচ বছরের তুলনায় গড়ে মাত্র ৫ শতাংশ কম ছিল। এতে দুর্ভিক্ষ হওয়ার কথা নয়! মোটামুটি একই পরিস্থিতিতে দুর্ভিক্ষ ১৯৪১ এ ও হতে পারত বলে তাঁর মত! কিন্তু তা হয়নি, হল '৪৩ এ। কারণ হিসেবে তিনি ও তাঁর মতই অন্যান্য গবেষকরা যা দেখান তা হল-

১৯৪২ এ বাংলায় আউশ ধানের উৎপাদন আগের চার বছরের তুলনায় শতকরা তিনভাগ কম হয়েছিল। প্রধান ফসল আমন ধান কম হয়েছিল তুলনায় শতকরা সতেরো ভাগ। বোরো ধান মোটামুটি অন্যান্য বছরের মত একই পরিমাণে ফলেছিল। এইটুকু কম ফলন মহামারী ঘটায়নি। ফসল উৎপাদন ও মাথাপিছু খাদ্যের বন্টনেও তফাত হয়নি সেরকম, পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায়। তবে ব্রিটিশের শোষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ঠিকই, এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল ব্রিটিশ-সৃষ্ট, তাদেরই মদতপুষ্ট কিছু দালাল, ফড়ে, চোরাচালানকারী, মজুতদারের দল। বস্তুত মহাযুদ্ধের সময় অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছিল। ফলে দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য বেসামাল হয়ে পড়ে। এদিকে মহাযুদ্ধের বাজারে দেশের খরচ অতি পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায়, সরকারকে নোট ছাপিয়ে যেতে হয়। ফলে একশ্রেণির লোকের হাতে এসে পড়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা। সেই পয়সার লোভে মরিয়া হয়ে একদল লোভী, অসাধু ব্যবসায়ী, মহাজন- জোতদার, দেশের খাদ্যশস্য গুদামজাত করে রেখে কালোবাজারির আশ্রয়ে চড়া দামে তা বিক্রি করে ক্রমশ অর্থের পাহাড়ে চড়তে থাকেন, ব্রিটিশের মদতপুষ্ট হওয়ায় এদের রোখার প্রশ্নই ওঠে না। এদের সংগ্রহের কারণে চালের দাম বাড়ে হু হু করে, এবং ক্রমশ তা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। আকাল আসে। একে একে গোরু-বাছুর, থালাবাসন, জমি-জিরেত, বাস্তুভিটে, বাপ-মা, ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী পর্যন্ত বেচে দিয়েও টাকায় কুলোয় না, চাল মেলেনা। ভাতের

আশা ছেড়ে একটু ফ্যানের আশায় গ্রামের বুভুক্ষু মানুষগুলি কলকাতার পথে এসে দাঁড়ায়। শহরের রাজপথ, পার্ক, অলিগলি ভ'রে ওঠে ক্ষুধাতুর, মরণাপন্ন, রোগজীর্ণ, কঙ্কালসার মানুষের জটলায়। পাশাপাশি বেড়ে চলে মৃতের স্তূপ। সরকারি মতে ৩৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু মানা হলেও, বেসরকারি মতে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ৫০ লাখে।

এই জায়গায় এই তথ্য ভুললে চলবে না যে, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলের মানুষ কিন্তু সেভাবে খাদ্যাভাব ভোগ করেননি। কারণ ব্রিটিশ সরকার নিজেদের স্বার্থেই এদের স্বার্থ বড় করে দেখেছিল। শহরাঞ্চলে খাদ্যাভাব প্রকট হলে শহরবাসীর গোলমাল, বিক্ষোভ ও আন্দোলনের সম্ভাবনায় শহরবাসীকে আগে থেকে তুষ্ট রাখার প্রকল্প নিয়েছিল তারা। 'এসেনশিয়াল সার্ভিস' এর জন্য জমিয়ে রাখা খাদ্যের অধিকাংশই তোলা ছিল কলকাতাবাসীর নামে। সরকারি রেশন দোকানগুলির মাধ্যমে খাদ্যের সাথে সাথে বস্ত্র, কেরোসিন, দেশলাই, চিনি প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মূল উদ্দেশ্য ছিল, রাজধানী কলকাতার নাগরিককে শান্ত রাখা, এবং তাহলে বাংলা প্রদেশের অনেক ঝামেলা এড়ানো সম্ভব হবে বলে মনে হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের।

যা হোক, ব্রিটিশ সরকারের এই কূটনীতির চালে গ্রাম-শহরের মাঝে দূরত্ব বাড়ে, কেবল তাইই নয়, গ্রামে এমনকি শোষকের প্রতিভূস্বরূপ সৃষ্টি হয় একদল মধ্যস্বত্তভোগী নতুন শ্রেণি মহাজন ও জোতদার।

পি আর সি বা পিপল্‌স রিলিফ কমিটি র প্রতিষ্ঠা এই সময় কমিউনিস্ট পার্টির তরফে খুবই সাধু উদ্যোগ বলে চিহ্নিত হয়। এই সংস্থার জন্ম পঞ্চাশের ভয়ানক দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে আকাল-পীড়িত মানুষের ত্রাণকার্যের উদ্দেশ্যে। জরাজীর্ণ, অর্ধমৃত, ক্ষুধার্ত মানুষকে অন্ন-বস্ত্র-অর্থ দিয়ে, চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ায় এই কমিটি। এর নেতৃত্বে ছিলেন সত্যেন্দনাথ মজুমদার, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্রনাথ রায়, স্নেহাংশুকান্ত আচার্যর মতো কিছু মানুষ। ২৪৯ নং বিপিন গাঙ্গুলী স্ট্রীটে পি আর সি র দপ্তর খোলা হয়েছিল।

দেখা যাচ্ছে ততদিনে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সাংস্কৃতিক শাখা হিসেবেই এর আত্মপ্রকাশ। অন্যান্য অনেক কাজের মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় নাটক, গান, আবৃত্তি করে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে পি আর সি র সাহায্য করা ছিল সেইসময় গণনাট্য সংঘ বাংলা স্কোয়াডের প্রধান কাজ।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও গণসংগীত

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বুলেটিন, ইস্তেহার, ঘোষণায় বারবার বলা হয়েছে যে, কোনো বুদ্ধজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক যাঁরা মানুষের কথা বলতে চান, তাঁরাই এখানে যোগ দিতে পারেন, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি বিশ্বস্ততা তাঁদের না থাকলেও চলবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সবসময়ই দেখা গেছে, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ মূলত কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখা হিসেবেই কাজ করে গেছে! যে কারণে উভয় সংগঠনকে ঘিরে আজও মানুষের মনে রয়ে গেছে কিছু বিভ্রান্তি।

যে সময়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের জন্ম, অর্থাৎ ১৯৪৩ সাল, সেই সময় বা তার সামান্য আগে-পরে পশ্চিমবঙ্গের পেশাদারি বাণিজ্যিক নাট্যশালাগুলির দিকে তাকালে দেখা যাবে বাস্তবজীবনের বিপর্যয় সেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ঐতিহাসিক, পোরাণিক কাহিনিরই চর্বিতচর্বণ চলছে সেখানে। বড়জোর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমাজজীবনের রঙিন ছবি সাজানো সেটের দেখা মিলবে। গরীব চাষী, শ্রমিক, দিনমজুরের জীবন সেখানে, নৈব নৈব চ। পরাধীন ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করার জন্য রমরমিয়ে চলছে 'মেবার পতন', 'গৈরিক পতাকা', 'রানী দুর্গাবতী', 'মহারাজা নন্দকুমার'; নতুবা দেবদেবীর মাহাত্ম্যে কাঙ্ক্ষিত ফললাভের আশা নিয়ে 'কর্ণার্জুন', 'সীতা', 'নরনারায়ণ' কিংবা 'কৃষ্ণার্জুন'এর মতো নাটক। এর বাইরে বেরিয়ে গণনাট্য বিপ্লব আনল ।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম বুলেটিনের (জুলাই,১৯৪৩) একেবারে শুরুতে বলা ছিল : 'People's theatre stars the people' অর্থাৎ গণনাট্য জনগণকে তারকায়িত করে। এই বুলেটিনে 'হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড' নাম দিয়ে সেইসময়ের দেশকালের সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমনটা একটু আগেই বলা হল। বুলেটিনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, দেশকালের মানসিকতার সঙ্গে দেশের থিয়েটার তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি বলেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। লোকশিল্পের পুরনো ও প্রচলিত মাধ্যমে নতুন ও উদ্দীপক বিষয় উপস্থাপন করার কথা ভেবেছে গণনাট্য। অতএব আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে, তারই মধ্যে দিয়ে আজকের সমস্যাকে দেখাতে হবে, খুঁজতে হবে সমাধানের পথ। নিজেদের প্রোডাকশান সম্বন্ধে সংঘের মত, তা

হবে 'সিম্পল' এবং 'ডিরেক্ট', জনগণ যাতে সহজেই বুঝতে পারে এবং নিজেরাও যাতে নতুন নাট্য প্রযোজনায় উৎসাহী হয়ে এগিয়ে আসতে পারে।

এইসকল লক্ষ্য স্থির ক'রে IPTA র আবির্ভাব। বোম্বাইয়ে তখন আয়োজিত হয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস, আর সেখানেই চলছে নিখিল ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের তৃতীয় সম্মেলন। ওই সম্মেলনে বাংলা ও সারা দেশ থেকে এসে জড়ো হয়েছিলেন সাহিত্যিক, শিল্পী, সংগীতজ্ঞ, নাট্যকার, অভিনেতারা। এঁরা সকলেই সম্মেলনে সানন্দে যোগ দিয়েছিলেন। এখানেই আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ', ২৫ মে, ১৯৪৩ এ। মূল সংগঠক ছিলেন পূরণচাঁদ যোশী। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। ওই সময়ে ওখানে 'জাতীয় সংস্কৃতি মেলা' নামে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিনয় ঘোষের নাটক 'ল্যাবরেটরী'র অভিনয় হয় সেখানে। সম্মেলনে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রমিকনেতা এন এম যোশী, সহ-সভাপতি কৃষকনেতা বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় আর সাধারণ সম্পাদক অনিল ডি সিলভা।

সংঘের বাংলা শাখা যে বিষয়গুলি নাট্যরচনায় ব্যবহার করেছিল সেগুলি হল : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসেবে ফ্যাসিজমের উদ্ভব, জাপানের ভারত আক্রমণ, মন্বন্তর, কালোবাজারি প্রভৃতি। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে লাগাতার শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষের জীবন সংগ্রাম গানে, নাচে, ছায়ানৃত্যে, ট্যাবলোয় বা নাটক মারফত সারা দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেবার প্রয়াস IPTA তৈরির কিছু আগে থেকেই শুরু হয়েছিল।

'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' এর মাসিক পত্রিকা 'জনযুদ্ধ' য় ১৬ মে, ১৯৪২ এ একটি বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল : 'জাপবিরোধী নাটক চাই। পুরস্কার ১০ টাকা'' পুরস্কৃত হয়েছিল বনস্পতি গুপ্তর লেখা 'দেশরক্ষার ডাক' নাটকটি।

এইসময় নাটককার দিগিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন দুই দৃশ্যের একটি ছোট নাটিকা, 'অভিযান'; বিষয় পঞ্চাশের মন্বন্তর। এরপর এরই পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে তৈরি হয় 'দীপশিখা'। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে দিগিন্দ্রনাথই ১৯৪২ এ লিখলেন 'অন্তরাল'। সমসময়ে মন্বন্তরকে নিয়েই বনস্পতি গুপ্তের 'পতঙ্গের প্রতিশোধ', প্রভাতকুমার গোস্বামীর 'একরাত্রি', জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত 'চালের দর' বিখ্যাত হয়। প্রসঙ্গত বলা হয়ে থাকে, জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তর 'ভাঙা চাকা' (রচনাকাল ১৯৩৬) নাটকটি এ যুগের প্রথম গণনাট্যের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। সুবোধ ঘোষের 'কর্ণফুলির ডাক', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ফুটপাত' এর মতো

একাঙ্কের কথাও উল্লেখযোগ্য। গুরুত্ব দাবি করে মন্বন্তরের পটভূমিতে শচীন সেনগুপ্তর লেখা 'রাজধানীর রাস্তায়', ১৯৪১ এ লেখা তুলসী লাহিড়ীর 'মায়ের দাবী' নাটিকাদুটিও।

এই পথ বেয়েই গণনাট্যের মঞ্চে এল একের পর এক মাস্টারপিস। বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', 'জবানবন্দী','নবান্ন', বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরী', কিংবা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি' যেমন।

খুব অল্প দিনের ভেতর গণনাট্যেরই হাত ধরে তৈরি হল সংগীতের একটি নতুন রূপ, যা লেখার বা গাইবার উদ্দেশ্য গণনাট্যের মতই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এরই নাম 'গণসংগীত'। সংগ্রামের গান, প্রতিবাদ, প্রতিরোধের গান এর আগে বাংলায় ছিল না তা নয়, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে গণনাট্য তৈরি না হলে 'গণসংগীত' এই নামটা কোনদিন পরিচিতি পেত না। কোন্ কোন্ রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে কীভাবে একটি চমৎকার শিল্পমাধ্যম গড়ে উঠতে পারে, তার ধারণাও শূন্যই থেকে যেত!

- অনুসন্ধান : দুই (সাংগীতিক পূর্বাধিকার নির্ভর)

গণনাট্যের হাত ধরে আবির্ভাবের আগে বাংলা গানের বিস্তৃত পরিসরে কোথাও গণসংগীতের বীজ সুপ্ত অবস্থায় ছিল কি না, সেই অনুসন্ধান শুরু করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে। কারণ যে সময়পর্বকে এই অভিসন্দর্ভের জন্য স্থির করা হয়েছে, তার একেবারে গোড়ার দিকে, অর্থাৎ গণনাট্য সংঘের জন্মের পরপর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বিভিন্ন মঞ্চে শিল্পীরা পরিবেশন করেছেন রবীন্দ্রনাথের গান। এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। দু'জন বিখ্যাততম শিল্পীর কথা না বললেই নয়; দেবব্রত বিশ্বাস ও সুচিত্রা মিত্র। সুচিত্রা আত্মজীবনীতে লিখছেন, প্রত্যক্ষভাবে আই পি টি এর সঙ্গে জড়িয়ে মাঠে ময়দানে গান গাইবার দিনগুলির বিবরণ-

> গণনাট্য সংঘের সক্রিয় সদস্য ছিলাম। কলেজে থাকতে গেট মিটিং করেছি। বক্তৃতা দিয়েছি। ঘাড়ে ঝান্ডা নিয়ে হেঁটেছি পথে পথে। একটা বিশ্বাস, একটা আদর্শের জন্য সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়েছিলাম। মিছিল, টিয়ার গ্যাস, লাঠিচার্জ- এসবের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। ... আই পি টি এ তে

থাকার সময় বিভিন্ন মিটিঙে, জমায়েতে, অনুষ্ঠানে আমি কিন্তু মূলত রবীন্দ্রনাথের গানই গেয়েছি। বহু সভায় গেয়েছি 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'। দেখেছি, কী অসম্ভব ছাপ ফেলে এই গান মানুষের মনে। অসংখ্য মানুষ খোলা ময়দানে নীরবে এ গান শুনেছেন।[২]

স্বদেশ পর্যায়ের এই গানটি সুচিত্রার কণ্ঠে, রাজনীতিগতভাবে উত্তাল পরিস্থিতিতে, সামনে থেকে শোনার অভিজ্ঞতা চিন্মোহন সেহানবীশের কেমন ছিল, সে সম্পর্কে আমাদের অবগত করেছেন গৌতম চট্টোপাধ্যায়-

১৯৪৬ এর অগাস্টে রক্তাক্ত ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় কলুষিত হল কলকাতা। শিল্পী-সাহিত্যিকরা বেরিয়ে এলেন রাজপথে দাঙ্গার বিরুদ্ধে মিলনের ডাক নিয়ে। সেই সংকটের সন্ধিক্ষণের বর্ণনা রেখে গেছেন ওই মিছিলের এক প্রধান সংগঠক চিন্মোহোন সেহানবীশ। তাঁর ভাষাতেই বলি : 'মনে পড়ে দাঙ্গার বিরুদ্ধে লেখক ও শিল্পীদের সেই অপূর্ব অভিযান। রাস্তার মোড়ে মোড়ে যখন সে মিছিল পৌঁচাচ্ছিল, নিমেষের মধ্যে মিছিলের গাড়িগুলিকে ঘিরে ফেলছিল হাজার হাজার শব্দাতুর মানুষ। তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে ট্রাকের উপরে দাঁড়িয়ে সুচিত্রা মিত্র ধরলেন 'সার্থক জনম মাগো'। সুচিত্রা বাংলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী আর তার কণ্ঠের ওই গান যে কী- যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই জানেন। তবু মনে হয়, দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতার শ্রীহীন রাস্তায় সেদিন তিনি মনপ্রাণ ঢেলে সে গান গেয়েছিলেন, তার যেন তুলনা নেই।'[৩]

দেবব্রত বিশ্বাসের ব্যাপার কিঞ্চিৎ আলাদা। গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে তিনি গাইতেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সলিল চৌধুরী, হারীন চট্টোপাধ্যায়ের গান ও অন্যান্য গণসংগীত। কিন্তু যেদিন থেকে রবীন্দ্রনাথ-পাগল জর্জ বুঝে গেলেন ওঁর গান মাত্রই লোকে বুঝছে গণসংগীত, সেদিন থেকে বেঁকে বসলেন তিনি। একবার দেবব্রতর কিছু বামপন্থী বন্ধু তো প্রশ্নই করে বসেন, কেন দেবব্রত রবীন্দ্রসংগীত গান! দেবব্রতর প্রতিক্রিয়া ছিল এরকম :

তাঁদের মতে রবীন্দ্রসংগীত নাকি একঘেঁয়ে প্যানপ্যানানি, প্রাণহীন সব গান। তখনো ইওরোপে যুদ্ধ চলছে। সেই দিনগুলিতে আরো অনেক সমিতির জন্ম হয়েছিল- মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, সোভিয়েত সুহৃৎ সমিতি, আরো নানা নামধারী সমিতি, যেগুলির নাম এখন মনে পড়ছে না। সেইসময় খুব সম্ভব মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে একটি গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে আমাকেও অংশগ্রহণ করতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল এবং ওখানে গাইতে রাজীও হয়েছিলাম। আমার সেই বিলেতফেরত বামপন্থী বন্ধুদের সেই অনুষ্ঠানে যেতে বলেছিলাম এবং তাঁরা গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে তাঁরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে গিয়েছিলেন যে রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে তাঁদের এতকাল ভুল ধারণা ছিল।[৪]

গণনাট্যের মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে যথেষ্ট বাধা পেয়েছিলেন জর্জ প্রথমদিকে। পরে নিজের বলিষ্ঠ গায়কীকে সম্বল করে ব্যাপারটাকে তিনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেন, এবং ইতিহাস সাক্ষী, সাফল্যও পান।

অর্থাৎ দুই স্বনামধন্য শিল্পীর জীবন অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়, রবীন্দ্রনাথের গান গণজাগরণের মঞ্চে, বা পথে-ঘাটে সর্বত্র, প্রতিবাদী কর্মশালায় গাওয়ার উপযোগী।

এই জায়গায়, এই দুই শিল্পীর আত্মজীবনী, বা অন্যদের স্মৃতিচারণা বা শিল্পীর জীবন অবলম্বনে লেখা উপন্যাস- প্রভৃতি ভিত্তি করে সেই রবীন্দ্রসংগীতগুলির একটি তালিকা করা যেতে পারে, যেগুলি গণনাট্যের মঞ্চে বহুবার গাওয়া হয়েছে-

১. 'ভাঙো, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, ভাঙো'

২. 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো'

৩. 'ওই ঝঞ্ঝার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে, বাজল ভেরী, বাজল ভেরী'

৪. 'নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল'

৫. 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে'

৬. 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন'

৭. 'এখন আর দেরি নয়' প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের আরো অনেক গান উল্লেখ করে দেখানো যেতে পারে, (সেগুলি সবই স্বদেশ পর্যায়ের নয়) মুক্তির ডাক, নতুন ভোরের স্বপ্ন, কঠিন পথ চলার কথা বারেবারে কেমন এসেছে সেখানে। পূজা পর্যায়ে এই গানটিতে যেমন গানকেই বলা হচ্ছে মুক্তির বাহন- "গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে/ রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে কাঁদন জেগে উঠে"। একইভাবে 'পূজা'রই আরেকটি গানে বলা আছে, গান যেন আর স্নিগ্ধতা-কোমলতা-শান্তির বাণী আনে না, দুঃখ, যন্ত্রণার আবহে সে দিতে চায় আশ্রয়- "কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে,/ সাগর মাঝে ভাসিয়ে দিলেম পালটি তুলে।/ যেখানে ঐ কোকিল ডাকে ছায়াতলে/ সেখানে নয়,/ যেখানে ঐ গ্রামের বধূ আসে জলে/ সেখানে নয়,/ যেখানে নীল মরণলীলা উঠছে দুলে/ সেখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে।" আবার এক গানে দেখা

গেল শুভ, মঙ্গল প্রভৃতি বোধ, যা কিছু নেতি দ্বারা আছন্ন হয়েছে, সেই নেতিকেও সাদরে গ্রহণ করছেন রবীন্দ্রনাথ, এমনই সাহসী তিনি-"...দুঃখরথের তুমিই রথী, তুমিই আমার বন্ধু।/ তুমি সঙ্কট তুমিই ক্ষতি, তুমি আমার আনন্দ।/ শত্রু আমারে করো গো জয়, তুমি আমার বন্ধু।/ রুদ্র তুমি হে ভয়ের ভয়, তুমি আমার আনন্দ।/ বজ্র এসো হে বক্ষ চিরে, তুমিই আমার বন্ধু।/ মৃত্যু লও হে বাঁধন ছিঁড়ে, তুমি আমার আনন্দ।" এই শেষ বাক্যটি, এই গানের মত, আরো অনেক গানের ভরকেন্দ্র; যেমন মৃত্যুর মত সত্য আর কঠিনকে বরণ করবার জন্য ব্যাকুলতা রবীন্দনাথের এই গানেও- "এখনো গেল না আঁধার, এখনো রহিল বাধা/ এখনো মরণব্রত জীবনে হল না সাধা।/ কবে যে দুঃখজ্বালা হবে রে বিজয়মালা, /ঝলিবে অরুণরাগে নিশীথরাতের কাঁদা।" তবে অত সহজে মিলবে না, যা ইপ্সিত, তাই এই গানে উপদেশ দেন তিনি- "এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে, হবে গো এইবার-/ আমার এই মলিন অহঙ্কার"; আর মনে ঠাঁই দিতে হবে আশার, ভালোবাসার, আর গানের, তাই বলা হল- "নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা।/ মন রে মোর, পাথারে হোস নে দিশেহারা।/ বিষাদে হয়ে ম্রিয়মাণ বন্ধ না করিয়ো গান,/ সফল করি তোল প্রাণ টুটিয়া মোহকারা।/ রাখিয়ো বল জীবনে, রাখিয়ো চির-আশা/ শোভন এই ভুবনে রাখিয়ো ভালোবাসা।" কেবল আশা, ভালোবাসাই নয়, দেখাতে হবে কাজ, হতে হবে কর্মঠ, তবেই আসবে সুদিন, মহামানবের বেশে। সেই বাণীর প্রকাশ রবীন্দনাথের যে গানে, তা কি গণসংগীত না হয়ে পারে? সেই গানটি সম্পূর্ণই তুলে দেওয়া গেল-

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐ যে তিনি, ঐ যে বাহির পথে।
আয় রে ছুটে, টানতে হবে রশি-
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি!
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে
ঠাঁই করে তুই নে রে কোনমতে।
কোথায় কী তোর আছে ঘরের কাজ
সে-সব কথা ভুলতে হবে আজ।
টান রে দিয়ে সকল চিত্তকায়া,
টান রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া,
চল্ রে টেনে আলোয় অন্ধকারে
নগরে-গ্রামে অরণ্যে পর্বতে।
ওই যে চাকা ঘুরছে রে ঝন্‌ঝনি,

বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি?
রক্তে তোমার দুলছে নাকি প্রাণ?
গাইছে না মন মরণজয়ী গান?
আকাঙ্খা তোর বন্যাবেগের মত
ছুটছে না কি বিপুল ভবিষ্যতে?

আবার খেয়াল করা যেতে পারে 'বাঁধন ছেঁড়ার সাধন' গানটিতেও সেই মহাত্মার স্তুতি- "যাঁহার হাতে বিজয়মালা/ রুদ্রদাহের বহ্নিজ্বালা/ নমি নমি সে ভৈরবে।/ কালসমুদ্রে আলোর যাত্রী/ শূন্যে যে ধায় দিবস-রাত্রি।/ ডাক এল তার তরঙ্গেরই,/ বাজুক বক্ষে বজ্রভেরী/ আকুল প্রাণের সে উৎসবে"। যে গানে প্রলয়ের বর্ণনা, প্রকৃতির সেই দুর্যোগের সাথে অনায়াসে মিলিয়ে নেওয়া যায় দেশের সামগ্রিক বিপর্যয়, একেবারে আজকেরও, চমক লাগে তখন! গানটি- "যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি।/ ঝড় এসেছে, ওরে, এবার ঝড়কে পেলেম সাথী!/ আকাশকোণে সর্বনেশে ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে/ প্রলয় আমার কেশে বেশে করছে মাতামাতি।/ যে পথ দিয়ে যেতেছিলেম, ভুলিয়ে দিল তারে,/ আবার কোথা চলতে হবে গভীর অন্ধকারে।/ বুঝিবা এই বজ্ররবে নূতন পথের বার্তা কবে/ কোন্ পুরীতে গিয়ে তবে প্রভাত হবে রাতি।" আসলে 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি' এইই মূল বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের। "সে ঝড় যেন সই আনন্দে চিত্তবীণার তারে/ সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত নাচাও যে ঝঙ্কারে।/ আরাম হতে ছিন্ন ক'রে/ সেই গভীরে লও গো মোরে/ অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান।"- এই প্রত্যয় গণসংগীত যাঁরা লিখেছেন পরবর্তীকালে, তাঁদের প্রভাবিত করেনি, সে কথা মানা কি যায়? যে অমানিশা ঘনিয়ে উঠেছিল চল্লিশের দশকে, বাংলাদেশে, এমনকি সারা পৃথিবী জুড়ে, তার প্রেক্ষিতেও রবীন্দ্রনাথের এই গান চমৎকার মানানসই হয় না কি?-"প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন/ দারুন ঘনঘটা, অবিরল অশনিতর্জন..." আবার ধরা যাক, এই গানটি; কী উদ্দামতা, কী তেজ, কী বেপরোয়াভাব এর ছত্রে ছত্রে! সুর-অসুরের রূপকে শ্রেণিদ্বন্দ্বের কথা যেন গণসংগীত হিসেবে গানটির গ্রহণযোগ্যতা আরো বাড়িয়ে দেয়-

পিনাকেতে লাগে টঙ্কার।
বসুন্ধরার পঞ্জরতলে কম্পন জাগে শঙ্কার।
আকাশেতে ঘোরে ঘূর্ণী, সৃষ্টির বাঁধ চূর্ণি।
বজ্রভীষণ গর্জনরব প্রলয়ের জয়ডঙ্কার।
স্বর্গ উঠেছে ক্রন্দি, সুরপরিষদ বন্দী।

তিমিরগহন দুঃসহ রাতে উঠে শৃঙ্খলঝঙ্কার।
দানবদম্ভ তর্জি রুদ্র উঠিল গর্জি।
লণ্ডভণ্ড লুটিল ধুলায় অভ্রভেদী অহঙ্কার।

আরেকটি গানে আবার নেই কোন রূপক, নেই আড়াল। খুব স্পষ্ট করে লড়াই এর ডাক সেখানে। গণজাগরণই উদ্দেশ্য, আর আছে বিপক্ষের প্রতি হুমকি! তবে গানের শেষটায় আশাবাদ, স্নিগ্ধতা-

বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে।
লুঠ-করা ধন ক'রে জড়ো কে হতে চাস সবার বড়ো-
এক নিমেষে পথের ধূলায় পড়তে হবে।
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায় নড়তে হবে।
নীচে বসে আছিস কে রে, কাঁদিস কেন?
লজ্জাডোরে আপনাকে রে বাঁধিস কেন?
ধনী যে তুই দুঃখধনে সেই কথাটা রাখিস মনে-
ধূলার 'পরে স্বর্গ তোমায় গড়তে হবে-
বিনা অস্ত্র, বিনা সহায়, লড়তে হবে।

অন্য একটি গান সকলের খুব পরিচিত। যে গান সাম্য, মিলন, শান্তির কথা বলে, যে থিমটি পরের দিকে বহু গণসংগীত রচয়িতা গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গানটির কয়েক পঙক্তি-" কলুষ কল্মষ বিরোধ বিদ্বেষ হউক নির্মল হউক নিঃশেষ/ চিত্তে হোক যত বিঘ্ন অপগত নিত্য কল্যাণকাজে।/ স্বর তরঙ্গিয়া গাও বিহঙ্গম, পূর্বপশ্চিমবন্ধুসঙ্গম/ মৈত্রীবন্ধনপুণ্যমন্ত্র-পবিত্র বিশ্বসমাজে।" কিন্তু এই শান্তির পথ তো সহজ নয়, দুঃখের মুখোমুখি হয়ে, তাকে যুঝে নিয়ে, তবেই তো মিলতে হবে শান্তিপারাবারে, আর সকলের সাথে। এই গানটিতে সেই কথা-" দুঃখকে আজ কঠিন বলে জড়িয়ে ধরতে বুকের তলে/ উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে।/ হেথায় কারো ঠাঁই হবে না, মনে ছিল এই ভাবনা,/ দুয়ার ভেঙে সবাই জুটেছে।" বিশ্বসভায় সকলের সঙ্গে যোগ দেবার ব্যাকুলতা অন্য একটি গানে এইভাবে এসেছে, তবে সে জন্য ভুলতে হবে যাবতীয় ক্ষুদ্রতা, লিখছেন রবীন্দ্রনাথ- "মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে/ আজি এ মঙ্গলপ্রভাতে/ উদয়গিরি হতে উচ্চে কহো মোরে : তিমির লয় হল দীপ্তিসাগরে-/ স্বার্থ হতে জাগো, দৈন্য হতে জাগো, সব জড়তা হতে জাগো জাগো রে/ সতেজ উন্নত শোভাতে।" এই যে বোধ, এই চেতনা শুধু

গণনাট্যের কালেই শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে দেখা যায়নি, রবীন্দ্রনাথ বহু আগেই তার ধারণা আমাদের দিয়েছেন, বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে তা স্মরণ রাখা প্রপ্যোজন। 'উই শ্যাল ওভারকাম' বা হেমাঙ্গ বিশ্বাসকৃত বঙ্গানুবাদ 'আমরা করব জয়' যদি গণসংগীত হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে, তবে রবীন্দ্রনাথের এই গানটিও পেতে পারেই বোধ হয়-

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ, জয়ী রে আনন্দগান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম, জয়ী জ্যোতির্ময় রে।
এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
ছাড়ো ঘুম, মেলো চোখ, অবসাদ দূর হোক,
আশার অরুণালোক হোক অভ্যুদয় রে।

"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব/ ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ"- এই ছবি রবীন্দ্রনাথ দেখেই গিয়েছিলেন, বিধান দিয়েছিলেন এই বলে "দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি,/ তব মঙ্গলশঙ্খ আন তব দক্ষিণপাণি/ তব শুভসঙ্গীতরাগ, তব সুন্দর ছন্দ"- এ গানকে যদি গণচেতনার গান না মানা হয়, তবে বোধ হয় ভুলই হবে!

এই পর্যন্ত আলোচনায় শুধুই 'পূজা' পর্যায়ের গানের কথা বলা হয়েছে। এবার আশা যাক 'বিচিত্র' তে। তরুণদলের উদ্দামতার গান, আগু-পিছু না ভেবে বিরাট কর্মযজ্ঞে নিজেকে সঁপে দেওয়ার গান এটি-

আমরা নূতন যৌবনেরই দূত
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।
আমরা বেড়া ভাঙি,
আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি।
ঝঞ্জার বন্ধন ছিন্ন করে দিই- আমরা বিদ্যুৎ!
আমরা করি ভুল-
অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে যুঝিয়ে পাই কূল।
যেখানে ডাক পড়ে জীবন-মরণ ঝড়ে আমরা প্রস্তুত।

সেই পরিস্থিতিরই বিবরণ দিয়ে, যাঁরা এখনও ঘুমিয়ে আছে, হাতে হাত দিয়ে লেগে পড়েনি দেশের দুর্দশা মোচনের কাজে, তাদের হাঁক দেন রবীন্দ্রনাথ, এই গানে-

আলোক-চোরা লুকিয়ে এল ওই-
তিমিরজয়ী বীর, তোরা আজ কই?
এই কুয়াশা-জয়ের দীক্ষা কাহার কাছে লই?
মলিন হল শুভ্র বরণ, অরুণ সোনা করল হরণ,
লজ্জা পেয়ে নীরব হল উষা জ্যোতির্ময়ী।
সুপ্তিসাগরতীর বেয়ে সে এসেছে মুখ ঢেকে,
অঙ্গে কালি মেখে।
রবির রশ্মি কই গো তোরা, কোথায় আঁধার-ছেদন ছোরা,
উদয়শৈলশৃঙ্গ হতে বল্ 'মাভৈঃ মাভৈঃ'।

আবার যে পথিক নির্ভীক, অন্ধকারে একলা পথ চলে, তার মুখ থেকেই শুনতে চান তিনি তার গন্তব্য, তার সাহস দেখে ভরসা পান মনে; কখনো বা মনে হয় আমাদের, অন্য কারো নয়, এ বুঝি রবীন্দ্রনাথের নিজেরই পথচলা, নিজেকেই করা প্রশ্ন-

তিমিরময় নিবিড় নিশা, নাহি রে নাহি দিশা-
একেলা ঘনঘোর পথে, পান্থ কোথা যাও?
বিপদ দুখ নাহি জানো, বাধা কিছু না মানো,
অন্ধকার হতেছ পার-কাহার সাড়া পাও?
দীপ হৃদয়ে জ্বলে, নিবে না সে বায়ুবলে
মহানন্দে নিরন্তর এ কী গান গাও?

নিজেরই ভেতরে জেগেছে তাঁর আশ্চর্য শক্তি, অনমনীয় মনোভাব, তার প্রকাশ আবার এই গানেও-

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন, ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে।
লক্ষ যুগের অন্ধকারে ছিল সঙ্গোপন, ওগো, তায় জাগাইনু রে।
পোষ মেনেছে হাতের তলে, যা বলাই সে তেমনি বলে-
দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাগাইনু রে।
অচল ছিল, সচল হয়ে ছুটেছে ওই জগৎ-জয়ে-
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইনু রে।

এই যে নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়া যুগের সঙ্কটকালে, বা অন্যকেও জেগে ওঠার ডাক দেওয়া- চল্লিশের দশকের বহু, বহু গণচেতনার গানে যা দেখা গেছে, রবীন্দ্রনাথের অনেক গানও তার বাইরে নয়, এইটি বোঝবার জন্যই এই দীর্ঘ আলোচনা।

গণসংগীতের প্রাকরূপ হিসেবে অনেকেই স্বদেশী গানকে ভেবে থাকেন। আমরাও তাদের সঙ্গে একমত। হতেই পারে, তা রবীন্দ্রনাথের লেখা 'স্বদেশ' পর্যায়ের গান, বা অন্য কারোর দেশাত্মবোধক গান, তবে ওই গানগুলি না লেখা হলে গণসংগীত নিজের রূপ পেতে আরো খানিক সময় নিত বলেই মনে হয়। সার্থক গণসংগীত রচিত হবার আগে, বা গণসংগীতের জন্মলগ্নে, যখন গানের জোগান ছিল কম, বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, মন্বন্তর-বিধ্বস্ত দেশে বহু গণশিল্পী তখন গেয়েছেন স্বদেশী গান। সেসব গানে ছিল না খুব প্রত্যক্ষভাবে শ্রেণিসংগ্রাম বা রক্তাক্ত বিপ্লবের কথা, কিংবা আন্তর্জাতিক কোন রাজনীতিও তার ভিতর উঁকিঝুঁকি মারেনি, তবু দেশকে রক্ষা করার ইচ্ছে বোনা ছিল ভীষণভাবে, কাজেই সেইসময় ওইসব স্বদেশী গান গায়কদের মুখে মোটেই বেমানান লাগেনি। এই জায়গায়, ব্যাকরণের দিক দিয়ে দুই ধারার গানের বিশেষত্ব স্পষ্ট করে নেওয়া যাক।

'স্বদেশী গান' রচনার দুটো মুখ্য উদ্দেশ্য-

১. উদ্দীপনা সৃষ্টি এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য দেশবাসীকে অঙ্গীকারবদ্ধ করা,

২. দেশবাসীকে স্বদেশের গৌরবময় অতীত সম্পর্কে অবহিত করে দেশকে হারানো দিনের যশ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

অন্যদিকে চল্লিশের দশকে বাংলায় লেখা অজস্র 'গণসংগীত' এ যা ছিল-

১. সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা,
২. দেশীয় জমিদার, জোতদার, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিরোধিতা,
৩. কৃষকশ্রেণি, শ্রমিকশ্রেণির মর্যাদা, সম্মান রক্ষা করার তাগিদ,
৪. প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে যাবার নির্দেশ।

খেয়াল করা যেতে পারে প্রথমত, 'দেশ', 'দেশের মানুষ' আর দ্বিতীয়ত উদ্দীপনা বা উত্তেজনা, যার প্রকাশ কথায়, সুরে দুক্ষেত্রেই সাধারণত – এই দুইটি কমন ইস্যু থেকেই গণজাগরণের মঞ্চে দেশাত্মবোধক গান গাওয়া হয়েছে অতীতে। কীভাবে দেশাত্মবোধক গান থেকে গণসংগীত অবধি পৌঁছান গেল, গানের উদাহরণ দিয়ে সেই দিকটি নিয়ে এবার কিছু কথা বলা কর্তব্য।

এদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক আন্দোলনকে গান দিয়ে সুষমামণ্ডিত করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলার সময় থেকে। এই মেলার প্রথম অধিবেশনে গীত

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারত সন্তান' গানটি ছিল সংগীতে স্বদেশচেতনার প্রথম উদ্বোধন। আরো যে সমস্ত গান হিন্দুমেলার গাওয়া হয়েছিল-

- মাতৃসম মাতৃভাষা পুরালে তোমার আশা, তুমি তার সেবা করো সাথে (ঈশ্বর গুপ্ত),

- জননী ভারতভূমি আর কেন থাকো তুমি, ধর্মহীন, ভূষণহীন হয়ে? (ঈশ্বর গুপ্ত),

- স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়? (রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়),

- মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারি (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর),

- দীনের দীন সবে দীন/ভারত হয়ে পরাধীন (মনমোহন বসু) প্রভৃতি।

এগুলির ভিতর লক্ষ্যণীয়, রঙ্গলালের অত আগে লেখা বিখ্যাত গানটির এই কয়েকটি পঙক্তি, যেখানে বিপ্লব কাঙ্ক্ষিত, গণসংগীতের মতই- "অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে, ভেরীর আওয়াজ!/ চলো চলো চলো সবে, সমর-সমাজ হে, সমর-সমাজ।/ সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে, বাহুবল তার;/ আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে, দেশের উদ্ধার।"

এই হিন্দুমেলার কিছু আগে-পরে জন্ম রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১), দ্বিজেন্দ্রলালের (১৮৬৩), রজনীকান্তের (১৮৬৫), অতুলপ্রসাদের (১৮৭১), চারণকবি মুকুন্দ দাসের (১৮৭৮)। আর এর সামান্য পরে, ১৮৮২ তে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' এর প্রকাশ। উপন্যাসের 'বন্দেমাতরম্' গানখানি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দীক্ষামন্ত্রে পরিণত হয়। হিন্দুমেলার শেষ দিককার অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথও অংশগ্রহণ করেছিলেন জানা যায়, কিন্তু স্বরচিত কোন্ কোন্ গান তিনি গেয়েছিলেন সে তথ্য আজও জানা যায়নি। তবে সমসময়ে লেখা তাঁর কিছু দেশাত্মবোধক গান- 'তোমারি তরে মা', 'অয়ি বিষাদিনী বীণা', 'ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি', 'ঢাকো রে মুখচন্দ্রমা', 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন'-এগুলি, সবই ওই পুরনো স্বদেশী গানের ধাঁচায় লেখা! ১৮৮৬ র ডিসেম্বরে কলকাতা কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে গাওয়া হয় বাংলার নিজস্ব রামপ্রসাদী সুরে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'। ১৮৯২ এ অতুলপ্রসাদ সেন বিলেত যাত্রার সময় ভেনিস বন্দরের গণ্ডোলার নাবিকদের গানের সুরে রচনা করেন 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী', যা কালজয়ী মুক্তির গানগুলির অন্যতম। ১৮৯৬ তে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'অয়ি ভুবনমনমোহিনী'। কাছাকাছি

সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচনা করেন ‘চল্ রে চল্ সবে ভারতসন্তান/ মাতৃভূমি করে আহ্বান’। এই গানের একেবারে শেষে হিন্দু-মুসলমানের সৌভ্রাতৃত্বমূলক অংশটি মনে করা যেতে পারে- “দলাদলি সবই ভুলি হিন্দু মুসলমান/ এক পথে এক সাথে চলো/ উড়াইয়ে একতা নিশান”- যা চল্লিশের গানেও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। অর্থাৎ বলার কথা এটাই যে, “তপ্ত রক্ত শিরায় জাগে/ নাম রে কূলে, চল্ রে আগে,/ দাঁড়াই গিয়ে পুরোভাগে/ অরির প্রতাপ হরি”- একজন মহিলার (স্বর্ণকুমারী দেবী) কলমে এই তেজ প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে, একইভাবে মুকুন্দদাসে, জীবন-মৃত্যুর কথা না ভেবে সংগ্রামে মানুষকে অংশ নিতে বলার তাগাদা- “বান এসেছে মরা গাঙে,/ খুলতে হবে নাও।/ তোমরা এখনো ঘুমাও?/ কত যুগ গেছে কেটে/ দেখেছ কত স্বপন/ এবার বদর্ বলে ধরো বৈঠা জীবন-মরণপণ” প্রভৃতি ‘৪৩ পরবর্তী গণজাগরণের বহু মঞ্চে মূল মন্ত্র হয়েছে। কাজেই, আবারও একবার স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে, গণসংগীতের অন্যতম পূর্বসূরী হিসেবে স্বদেশী গানকে।

১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন স্বদেশি গানে আনে প্লাবন। অসংখ্য গীতিকার নব উদ্যমে লিখতে থাকেন দেশমুক্তির গান। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ গানগুলিও এই সময়েরই রচনা। সেই তালিকায় ‘এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে’, ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে’, ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে’, ‘মা কি তুই পরের দ্বারে’, ‘তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে’, ‘ছি ছি চোখের জলে ভেজাস না’, ‘যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক’, ‘যে তোরে পাগল বলে’, ‘ওরে, তোরা নেই বা কথা বললি’, ‘যদি তোর ভাবনা থাকে’, ‘আপনি অবশ হলি’, ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’, ‘বিধির বাঁধন কাটবে তুমি’, ‘আমাদের যাত্রা হল শুরু’, ‘ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে’, ‘আজ সবাই জুটে আসুক’, ‘ওরে ভাই মিথ্যা ভেবো না’, ‘সার্থক জনম আমার’, ‘আমরা পথে পথে যাব সারে সারে’, ‘আমার সোনার বাংলা’, ‘ও আমার দেশের মাটি’, ‘ঘরে মুখ মলিন দেখে’, ‘নিশিদিন ভরসা রাখিস’, ‘বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি’, ‘আমি ভয় করব না’, ‘এখন আর দেরি নয়’- এই গানগুলি। এই গানগুলি অধিকাংশই ছিল বাউল সুরে গাঁথা। বাউল সুর বাংলার স্বকীয় সুর- সেই সুরের মাধ্যমে গানগুলি সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছবে- এই ছিল রবীন্দ্রনাথের আশা। সুরের দিক থেকে ব্যতিক্রমী একটি গান ‘আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে’। এই গানের শেষ তিন পঙক্তিতে বলা আছে- “ ফেলো জীর্ণ চীর, পরো নব সাজ/ আরম্ভ করো জীবনের কাজ/ সরল সবল আনন্দমনে, অমল অটল জীবনে”- গণসংগীত যে খুব সহজ করে বললে জীবনের জয়গানই গাইতে চায়, রবীন্দ্রনাথের এই গানে সেই সহজে পৌঁছে যাওয়া আছে।

'স্বদেশ' পর্যায়ের আরেকটি গান, রবীন্দ্রনাথের, সম্পূর্ণ উল্লেখ করা জরুরি, সত্যের প্রতি, ন্যায়ের প্রতি গভীর প্রত্যয় সেখানে প্রকাশিত-

রইল বলে রাখলে কারে, হুকুম তোমার ফলবে কবে?
তোমার টানাটানি টিঁকবে না ভাই, রবার যেটা সেটাই রবে।
যা-খুশি তাই করতে পারো, গায়ের জোরে রাখো মারো-
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে তিনি যা সন সেটাই সবে।
অনেক তোমার টাকা করী- অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাবছ হবে তুমিই যা চাও, জগৎটাকে তুমিই নাচাও-
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে, হয় না যেটা সেটাও হবে।

এই যে বিপক্ষ হিসেবে এক 'তুমি' বা 'তোমরা'র অবস্থান, শ্রেণিগত দ্বন্দ্বের অবতারণা- এই বিষয়টি যে গণসংগীতেরই মূল প্যাটার্ন- তা কারো অজানা নয়। এই 'তুমি' ক্ষেত্র বিশেষে হয়ে উঠেছে 'ওরা', যেমন এই গানে-

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।
আজকে যে তোর কাজ করা চাই,
স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই-
এখন ওরা যতই গর্জাবে ভাই, তন্দ্রা ততই ছুটবে।
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে।
ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে, গড়বে ততই দ্বিগুণ করে!
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা ততই যে ঢেউ উঠবে।...

কাজেই এই গানকেও 'গণসংগীত' হিসেবে দেখা যেতে পারে, এই আমাদের বিবেচনা।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বঙ্গভঙ্গের কালে আর যাঁরা গীত রচনায় নতুন করে মনোনিবেশ করলেন, তাঁরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অমৃতলাল বসু, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মুকুন্দদাস প্রমুখ। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানের ভিতর 'ধন-ধান্য-পুষ্পভরা', 'ভারত আমার ভারত আমার', 'বঙ্গ আমার জননী আমার', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' জনপ্রিয় হয় খুব। রজনীকান্তের স্বদেশী গানগুলির মধ্যে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' হয়ে ওঠে কালজয়ী। এ ছাড়াও তাঁর অন্যান্য

দেশাত্মবোধক গানগুলি- 'তাই ভালো মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত', 'ফুলার কল্লে হুকুম জারি', 'আয় ছুটে ভাই হিন্দু মুসলমান', 'শ্যামল শস্য ভরা', 'ভারত কাব্য নিকুঞ্জে- জাগো সুমঙ্গলময়ী মা', 'বিধাতা আপনি এসে পথ দেখালে', 'রে তাঁতী ভাই', 'জয় জয় জন্মভূমি জননী', 'এবার সোনার বাংলা ভাগ করে ভাই কল্লেরে দুখান', 'তোরা আয়রে ছুটে আয়', 'আমরা নেহাত গরীব', 'আর কীসের শঙ্কা', 'কেমন বিচার কচ্ছে গোরা' প্রভৃতি। অন্যদিকে সশস্ত্র প্রতিরোধের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন নিজের গানে মুকুন্দদাস। 'আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম/ তবে ফিরিঙ্গী বণিকের গৌরব রবি/ অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম', 'ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে/ মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে' –এই ছিল ওঁর প্রতিবাদের ধরণ। প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'নম বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী', 'জাগরণী শুভদিনে শুভক্ষণে গাহ আজি জয়', 'হে মাতঃ বঙ্গ' প্রভৃতি গানও ওই সময়ে যথেষ্ট জনাদৃত হয়। বঙ্গভঙ্গকেই বিষয় করে কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদ লেখেন 'ছিন্ন হল বঙ্গ কেন ভাব অমঙ্গল', 'এক দেশে থেকে এক মাকে ডাকি' প্রভৃতি। অতুলপ্রসাদের চার পাঁচটি স্বদেশী গান যুগে যুগে মানুষের প্রিয়র তালিকায় থেকে যায়। গানগুলি- 'উঠ গো ভারতলক্ষী', 'বলো বলো বলো সবে', 'হও ধরমেতে ধীর', 'মোদের গরব মোদের আশা', 'ভারত ভানু কোথা লুকালে'।

খেয়াল করবার যে বিষয়টি এক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথ বাদে বাকি যাঁরা গীতিকার, তাঁদের গানগুলি পরাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে লিখিত তো বটেই এবং সেগুলি ওই প্রেক্ষাপটকে ছাড়িয়ে যুগোত্তীর্ণ হয়নি কখনোই। 'গণসংগীত' এর প্রাথমিক ধাপ হিসেবে তাদের দেখা যায়, কিন্তু ওই পর্যন্ত। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের কিছু গান, যা আলোচনায় রাখা হয়েছে, সেগুলি বিভিন্ন প্রেক্ষিতে লেখা হলেও, প্রেক্ষিত মুছে গিয়ে গানগুলি কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছে। 'গণসংগীত' টার্মটি রবীন্দ্রনাথ দেখে, জেনে যাননি ঠিকই, কিন্তু তাঁর ওইসকল গানগুলি অতি উচ্চমানের 'গণসংগীত' হিসেবেও নির্ধারিত হতে পারে বলে আমাদের মত।

১৯২০ সাল নাগাদ নজরুলের হাতে মুক্তির গানের এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়। 'কারার ওই লৌহ কপাট/ ভেঙে ফেল কররে লোপাট/ রক্ত-জমাট শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী/ ওরে ও তরুণ ঈশান/ বাজা তোর প্রলয় বিষাণ!/ ধ্বংস-নিশান উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি!.../ নাচে ওই কালবোশেখী/ কাটাবি কাল বসে কি?/ দে রে দেখি ভীম কারার ওই ভিত্তি নাড়ি!/ লাথি মার্, ভাঙ্ রে তালা!/ যতসব বন্দীশালায়/ আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি"- প্রতিটি রক্তবিন্দুতে আগুন জ্বালানো এমন প্রতিবাদী শব্দবন্ধ বাংলা স্বদেশী গান আগে পায়নি। পাশাপাশি ওঁর 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার', 'তোরা সব

জয়ধ্বনি কর', বা ' এই শিকল পরা ছল মোদের, এই শিকল পরা ছল' এইয় তেজী গানগুলিকেও 'গণসংগীত' এর জন্মের পথে আরেক ধাপ এগনো বলেই ভাবা যেতে পারে। বিদেশী শাসন, শোষণের বিরোধিতা করে লেখা বলে এগুলিকে 'স্বদেশী গান' এর তালিকাতে রাখাই যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তাহলে নজরুল যখন লেখেন কৃষকদের গান, শ্রমিকের গান, নারী জাগরণের গান, সৈন্যদলের গান- সেগুলিকে 'গণসংগীত' হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে উপায় থাকে না। দু'- একটি গানের নমুনা দেওয়া যাক। যেমন কৃষাণের গান-

ওঠ্ রে চাষী জগদ্বাসী ধর্ কষে লাঙল।
আমরা মরতে আছি, ভালো করেই মরব এবার চল।...
ও ভাই, আমরা ছিলাম পরম সুখী, ছিলাম দেশের প্রাণ।
তখন গলায় গলায় গান ছিল ভাই, গোলায় গোলায় ধান,
আজ কোথায় বা সে গান গেল ভাই, কোথায় সে কৃষাণ?
ও ভাই, মোদের রক্ত জল হয়ে আজ ভরতেছে বোতল।
আজ চারদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত।
ও ভাই, জোঁকের মতন শুষছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত।
মোর বুকের কাছে মরছে খোকা, নাইকো আমার হাত!
আর সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেলছে খেলা খল!

কিংবা শ্রমিকের গান-

ওরে ধ্বংস পথের যাত্রীদল-
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল।
আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই,
পায়ের সুখে ভাঙব চল্!
ধর্ হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।
ও ভাই আমাদেরই শক্তিবলে
পাহাড় টলে তুষার গলে
মোরা সিন্ধু মথে এনে সুধা
পাই না ক্ষুধায় বিন্দু জল!
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল।...
যত শ্রমিক শুষে নিঙরে প্রজা
রাজা-উজির মারছে মজা,
আমরা মরি বয়ে তাদের বোঝা রে।

এবার জুজুর দল ওই হুজুর দলে
দলবি রে আয় মজুর দল!
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল।...
ও ভাই, দালান-বাড়ি আমরা গড়ে
রইনু জনম ধূলায় পড়ে
বেড়ায় ধনী মোদের ঘাড়ে চড়ে রে!
আমরা চিনির বলদ চিনিনে স্বাদ
চিনি বওয়াই সার কেবল
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল।
ও ভাই আমরা মায়ের ময়লা ছেলে
কয়লা খনির বয়লা ঠেলে
যে অগ্নি দিই দিগ্‌বিদিকে জ্বেলে রে!
এবার জ্বালবে জগৎ কয়লা-কাটা
ময়লা কুলির সেই অনল।

আবার ১৯২৬ এ ফরিদপুর, মাদারিপুরে নিখিলবঙ্গীয় ও আসাম স্বদেশী মৎসজীবী সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য নজরুল রচনা করেন ধীবরদের গান-

আমরা নীচে পড়ে রইব না আর-
শোন্ রে ও ভাই জেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে! ...
ও ভাই, মোদের ঠাঁই দিল না
আপন মাটির মায়ে।
তাই জীবন মোদের ভেসে বেড়ায়,
ঝড়ের মুখে নায়ে।
ও ভাই, নিত্য নতুন হুকুম জারি
করছে তাই সব অত্যাচারী রে!
তারা বাজের মতন ছোঁ মেরে খায়,
আমরা মৎস পেলে!
এবার উঠব রে সব ঠেলে!...

এ গানের শেষে গিয়ে সিদ্ধান্ত হয় যূথবদ্ধতার, সম্মিলিতভাবে উর্ধ্বতনের বিরুদ্ধে লড়বার-

আমরা খেপলা জাল আর ফেলব না ভাই,
একলা নদীর তীরে।

আয় একসাথে ভাই সাত লাখ জেলে,
ধর্ বেড়াজাল ঘিরে।
ওই চৌদ্দ লক্ষ দাঁড় কাঁধে ভাই
মল্লভূমির মল্লবীর আয়রে।
ওই আঁশ-বটিতে মাছ কাটি ভাই,
কাটব অসুর এলে!
এবার উঠব রে সব ঠেলে!

'ইন্টারন্যাশনাল' গানটির চমৎকার অনুবাদ করেছিলেন নজরুল, আর এই ঘটনার মধ্য দিয়েই ওঁর কৃষকের গান, শ্রমিকের গান বা ধীবরের গানের মত গণসংগীত রচনার ধারাবাহিকতায় একটা সিলমোহর যুক্ত হয়। কাজেই নজরুলের হাতেই যে 'গণসংগীত' এর জন্ম আক্ষরিকভাবে, সে কথাটা এইখানে স্পষ্ট করে বলে নিয়ে, 'ইন্টারন্যাশনাল' এর নজরুলকৃত অনুবাদটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল-

জাগো, জাগো অনশনবন্দী, ওঠো রে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত!
যত অত্যাচারে আজি বজ্রহানি'
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,
নব জনম লভি' অভিনব ধরণী ওরে ঐ আগত।
আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র আচার
মূল সর্বনাশের এরে ভাঙিব এবার!
ভেদি দৈত্য কারা আয় সর্বহারা!
কেহ রহিবে না আর পর-পদ আনত।
নব ভিত্তি পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে!
শোন্ অত্যাচারী! শোন্ রে সঞ্চয়ী!
ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী।
ওরে সর্বনেশের এই সংগ্রাম-মাঝ
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ!
এই 'আন্তর- ন্যাসনাল সংহতি' রে
হবে নিখিল-মানব-জাতি সমুদ্ধত।

সূত্রনির্দেশ

১. গোস্বামী পরিমল (সম্পা.), "নিবেদন", *মহামন্বন্তর*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৭

২. মিত্র সুচিত্রা, *মনে রেখো,* আজকাল, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৪৩-৪৪

৩. চট্টোপাধ্যায় গৌতম, "বজ্রের সুরে গান গেয়েছিলেন সুচিত্রা", সোম স্বপন (সম্পা.), *সুচিত্রা*, কারিগর, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৪৩-৪৪

৪. বিশ্বাস দেবব্রত, "বাঁয়ের রাস্তা", *ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৮-৫৯

বাংলা গণসংগীতের পাঁচ দশক (১৯৪০-১৯৯০), নির্বাচিত গীতিকারের গান : লোকপ্রিয়তার নিরিখে বিশ্লেষণ

ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সাংস্কৃতিক শাখা হিসেবে গণনাট্য সংঘ একেবারে প্রতিষ্ঠা (১৯৪৩)র পরপরই যাত্রা, পালা, নাটক, কথকতা, গান, গীতিকা, ছড়া, নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য, ছায়ানৃত্য প্রভৃতির মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তৎপরতা দেখায়। সেটাই কাঙ্ক্ষিত ছিল বটে। এইসব শিল্পমাধ্যমের ভেতর নিজেরই গুণে গানগুলি জনপ্রিয়তা পায় সবচেয়ে বেশি, মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। নজরুল তো তার আগেই বেঁধে দিয়েছিলেন, সেই সুরে সুর মেলাতে আসেন যাঁরা, তাঁদের নিয়েই মূলত আমাদের বর্তমান অধ্যায়। গণসংগীতের ইতিহাসে তাঁদের অবদান খেয়াল করে দেখার পাশাপাশি এটাও দেখার মত বিষয় যে, যা তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল, সমাজের নিচুতলার মানুষের কাছে পৌঁছনো, তা তাঁরা কতটা পূরণ করেছেন, নাকি নিজেদেরই সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে মিলিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণিরই পছন্দসই হয়ে উঠতে চেয়েছেন তাঁরা, বা হয়েছেন! বহু মানুষ গণসংগীত লিখেছেন গণনাট্যের সূচনাপর্বে, বহু গায়ক গেয়েছেন, বহুজন নাচ ও বাদ্যের সহযোগিতায় গণসংগীতের উপস্থাপনাকে আরো চমকপ্রদ করে তুলেছেন, তাঁদের সবাইকে নিয়ে আলোচনা করা গবেষণার এই সীমিত পরিসরে সম্ভবপর নয় বলে, কিছু গীতিকারকে বেছে নেওয়া হয়েছে যারা একান্তই গুরুত্বপূর্ণ। কাজ এবং 'জনপ্রিয়তা'ই তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ করেছে, বলাই বাহুল্য। তবে বাকিদের প্রতি, যেমন ধরা যাক গায়কদের ভিতর ভূপতি নন্দী, সুরপতি নন্দী, দিলীপ রায়, সত্যজীবন ভট্টাচার্য, সুজাতা মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায়, প্রীতি রায়চৌধুরী, সাধনা গুহ, সাধনা রায়চৌধুরী, বেলা রায়, ঊষা দত্ত, প্রীতি ব্যানার্জী, আলপনা গুপ্ত; নৃত্যশিল্পীদের ভিতর শম্ভু ভট্টাচার্য, মন্টু ঘোষ, পানু পাল, রেবা রায়; যন্ত্রীদের মধ্যে টগর অধিকারী, মঘাই ওঝা প্রমুখের প্রতিও আমাদের অশেষ শ্রদ্ধা।

- জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (১৯১১-১৯৭৭)

এল ১৯৪৩ সাল, বাংলায় ১৩৫০। গোটা বাংলাদেশ জুড়ে, বিশেষ করে শহর কলকাতায়, মহামন্বন্তরের করাল ছায়া চারদিক অন্ধকার করে দিল। আর ঘরে থাকা যাচ্ছিল না। জমাট সাহিত্যিক আড্ডা ও রিহার্সাল ছেড়ে আমরা সবাই রাস্তায় নেমে পড়লাম। চরম বিপর্যয় ও বীভৎস মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম। চৌরঙ্গী, কালীঘাট, লেক মার্কেটের মোড়, বালিগঞ্জ...ওদিকে শেয়ালদা, শ্যামবাজারের মোড়। সর্বত্র এক দৃশ্য- শত সহস্র কঙ্কাল ফেন দাও ফেন দাও বলে চিৎকার করছে। পেটের জ্বালায় গ্রাম উৎখাত করে শহরে এসে অন্নদাতা কৃষক ও জগদ্ধাত্রী কৃষাণী দুমুঠো অন্ন ভিক্ষা চাইতেও সাহস পায় না- বলে ফেন দাও। মনুষ্যত্বের কী অবমাননা! গোরু-ছাগলের খাদ্য নিয়ে মানুষে মানুষে কাড়াকাড়ি। ডাস্টবিনের পচা এঁটোকাঁটা নিয়ে কুকুরে-মানুষে মারামারি। আর দেখলাম মৃত্যু- অমৃতের সন্তানরা মরছে, যেন পোকামাকড়।

একদিন দেখলাম মা মরে পড়ে আছে। তার স্তন ধরে অবোধ ক্ষুধার্ত শিশু টানাটানি করছে আর হেঁচকি তুলে কাঁদছে।

এর প্রচণ্ড অভিঘাত আমার গোটা অস্তিত্বকে কাঁপিয়ে দিল। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম- না না না!

অস্থির পায়ে দৌড়তে দৌড়তে হেঁটে চলেছি আর মনে মনে বলছি- We won't allow people to die। মানুষের তৈরি এই দুর্ভিক্ষ মানব না, প্রতিরোধ করব, উত্তীর্ণ হব। হাত মুঠো করে আবার বলে উঠলাম- না না না।

এই হল শুরু। মনে নেই কার বাড়িতে গিয়ে হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছিলাম, কার কাগজ ধার করে কার কলমে লিখেছিলাম। সুর আর কথা মনের বেদনা ও যন্ত্রণার উৎসমুখ থেকে ঝরনার মতো বেরিয়ে এল। শুরু হল 'নবজীবনের গান':

'না না না।
মানব না মানব না।
কোটি মৃত্যুরে কিনে নেব প্রাণপণে,
ভয়ের রাজ্যে থাকব না...'

এই প্রতিবাদ আমাকে নিয়ে এল মানুষের জীবন সংঘর্ষের পাশাপাশি। হয়ে গেলাম তাদের সহযাত্রী-সংগ্রামী কবি সুরকার গায়ক। ...

রোজই রাস্তায় মরণ দেখতাম। একদিন একটি বৃদ্ধকে দেখলাম খাদ্য চাইতে চাইতে মুখ থুবড়ে পড়ল, আর কথা নেই। কিছুক্ষণ বাদে পুলিসের লোক এসে লাঠি দিয়ে ঠেলে তাকে রাস্তার ধারে সরিয়ে দিল।

'পথে পথে শঙ্কা
মোড়ে মোড়ে বাজে মৃত্যুর জয়ডঙ্কা।

ধনগৌরব মাখা যুদ্ধের অঙ্গ।
আমরা তো সৈনিক
বুভুক্ষু দৈনিক
আমরা কি দেব রণে ভঙ্গ।'

মনের বেদনা ও যন্ত্রণার রুদ্ধ উৎস থেকে ঝরনার মতো বেরিয়ে আসতে লাগল একটার পর একটা গান- নবজীবনের গান।

এই প্রাণান্তকর জীবনযন্ত্রণাই শেষ কথা নয়, মৃত্যুকে পেরিয়ে বাঁচবই, নবজীবনের আলো দেখবই- এই বিশ্বাস আমাদের উদ্বুদ্ধ করত। এই ছিল 'নবজীবনের গানে'র মূল সুর। ...[১]

এই হল 'নবজীবনের গান' এর জন্ম-ইতিহাস। গীতিকারেরই নিজের কলমে। এই যে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বললেন, কার ঘরে গিয়ে, কার থেকে কাগজ চেয়ে, লিখে, কার হারমোনিয়ামে সুর করা হল সেই গান, তা আর খেয়াল নেই; খুব সম্ভবত, এই জায়গাটি খেয়াল রেখেই বাসব দাশগুপ্ত দেবব্রতকে নিয়ে যখন লেখেন 'জর্জ' উপন্যাসটি, তখন এই তথ্য যোগ করেন, ওই ঘর আসলে দেবব্রতর ঘর, হারমোনিয়ামও তাঁরই, দুজনে মিলে লোকসঙ্গীত আর গণসঙ্গীতের সুর মিশিয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে ফেলেন একে একে গানগুলির। আত্মজীবনীতে এই তথ্য দেবব্রতই দিয়ে গেছেন; বাসববাবুর বর্ণনায় কেবল দুজনের উত্তেজনা আর পাগলামি দারুণ জীবন্ত হয়ে ওঠে-

বটুক খাতা খুলে গান পড়তে লাগল। হাহাকার, অন্নের অভাব, যন্ত্রণা, দারুণ কষ্ট ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। শুনতে শুনতে জর্জ খাঁড়া হয়ে উঠে বসল। এ কি, এ যে তারও মনের কথা!

চোখের সামনে মানুষের মৃত্যু। পার্কে, স্টেশনে, রাস্তায় পড়ে আছে শিশু, বৃদ্ধদের মৃতদেহ। খাবার দোকানের সামনে করুণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকা নিরন্ন মানুষ। দূর গ্রামগঞ্জ থেকে খাবারের সন্ধানে শহর কলকাতায় আসা। মানুষের কী অপরিসীম দুরবস্থা! সহ্য করা যায় না। কতবার জর্জের মনে হয়েছে, এদের নিয়ে গান কই? এই যন্ত্রণার প্রকাশ কোথায়? আজ বটুকের গানের কথায় সে খুঁজে পেল যুগ-যন্ত্রণাকে।

উঠে দাঁড়িয়ে বটুকের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'পাইছি, দিন-রাত, সর্বক্ষণ যে কথা খুঁজতেছিলাম, তুমি তাই লিখছ!'

উত্তেজনায় কাঁপছে জর্জ। 'তুমি আমাদের চিন্তারে ভাষা দিছ। আমাদের বিশ্বাস এই অন্ধকারই শেষ না, এরপর অপেক্ষা কইরা আছে নতুন জীবন, নতুন দিন। এই কষ্ট আম্মাগো অতিক্রম করতেই হইব।'

'ঠিক বলেছ জর্জ, প্রত্যেক রাতের পরেই আবার নতুন প্রভাত। এই গানগুলোর নাম হোক 'নবজীবনের গান'। এই প্রচণ্ড অনাহার, অসহায় মানুষদের কাছে নতুন জীবনের বার্তা পৌঁছে দেব গানে গানে। এসো আমরা সুরে বসাই কথাগুলো। এসো, জর্জ।'...

দ্রুত গোটা একটা গানের সুর হয়ে গেল। ওদের মধ্যেই যেন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল সুর, কথার স্পর্শ পেয়ে জেগে উঠেছে। জর্জ বলল, 'বুঝলা বটুক, আম্‌গো দ্যাশের মা প্রার্থনা করছিল সন্তানরে দুধে-ভাতে রাখোনের। সেই দ্যাশরে কুথায় হাজির করলাম আমরা!

'সে তো বুঝলাম, কিন্তু এখন আমাদের ভূমিকাটা কী হবে?'

'ঠিক বুঝিনা। তবে গানডায় সুর কইর‍্যা মনডা হালকা হইল। মনে হইতাছে কিছু একডা করলাম। বুক থেইক্যা একডা চাপ সরলো মনে হইতাছে। ...[২]

'নবজীবনের গান'(১৯৪৩) আসলে কীরকম, ঠিক কী লেখা আছে তাতে, কেমন তার প্যাটার্ন- এই বিষয়গুলিতে যাওয়ার আগে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর জীবন সম্বন্ধে প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে রাখা যাক, কারণ তাঁর পরিবার, তাঁর বেড়ে ওঠা আমাদের আলোচনাকে প্রভাবিত করবে।

জ্যোতিরিন্দ্র জন্মেছিলেন মামাবাড়ি শ্রীরামপুরে। ডাকনাম রাখা হয়েছিল বটুক। বাবা যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র ছিলেন অধুনা বাংলাদেশের পাবনা জেলার শীতলাই গ্রামের জমিদার। একসময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অন্যতম সহকারী যোগেন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মা সরলা দেবী। জ্যোতিরিন্দ্ররা ছিলেন ছ' ভাই, ছ' বোন। ওঁর প্রাথমিক শিক্ষা পাবনা জেলা স্কুলে, পরে কলকাতা ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন, স্নাতকও হন রসায়নে অনার্স নিয়ে। তারপর মেধাবী জ্যোতিরিন্দ্র মেডিক্যাল কলেজে পড়বার সুযোগ পেলেও সাহিত্য পাঠের আকর্ষণে ইংরেজিতে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন, ১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন।

ছোটবেলা থেকেই গানবাজনার প্রতি তাঁর ঝোঁকছিল। উচ্চাঙ্গ সংগীত শেখেন কাকা হরিচরণ চক্রবর্তী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। বাড়িতেও চমৎকার রেওয়াজ ছিল শাস্ত্রীয় সংগীতের। বাবা গান গাইতেন, অসাধারণ পাখোয়াজও বাজাতেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ওস্তাদদের আনাগোনা লেগেই থাকত বাড়িতে। আবার লোকসংগীতের সমাদর, চর্চা দুইই করতেন যোগেন্দ্রনাথ। বাউল গান, কবিগান, জারিগান, সারিগানের আসর বসত প্রায়ই। সেখান থেকেও শেখা আপনিই ঘটেছে জ্যোতিরিন্দ্রের। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের গানের তালিমও ছিল। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতিই পক্ষপাত ছিল বরাবর। স্মৃতিচারণায় নিজেই লিখেছেন-

একেবারে বাল্যকাল থেকেই, আমি রবীন্দ্রসংগীতের আবহাওয়ায় পুষ্ট হয়েছি। নিতান্ত শৈশব থেকেই (১৯১৫), আমার বয়স যখন চার বছর, রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি, তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন পাবনা সম্মেলন উপলক্ষ্যে। যৌবনের বিকাশের মুখেও বারবার তাঁর সংস্পর্শে এসেছি। ঠাকুরবাড়ির অনেকেরই কাছে রবীন্দ্রসংগীত শেখার সুযোগ হয়েছিল- বিশেষ করে ইন্দিরা দেবী ও সরলা দেবীর কাছে। আর মনে পড়ে দিনেন্দ্রনাথকে।

তা ছাড়া অনাদি দস্তিদার, শৈলজারঞ্জন, শান্তিদেব প্রমুখ রবীন্দ্রসংগীতের অন্যান্য প্রবক্তার কাছেও রবীন্দ্রসংগীত শেখার সুযোগ পেয়েছি।[৩]

এই অবধি জানবার পর, এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন আশা করি, এমন বহুমুখী ও সুবিস্তৃত সংগীতশিক্ষার পটভূমি নিয়ে একজন শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী, বা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী বা লোকশিল্পী হয়ে ওঠাই ছিল জ্যোতিরিন্দ্রের দস্তুর। এ কথা ভাবলেও খুব ভুল হয় না বোধ হয়, পারফর্মার হবার কথা ভেবেই তাঁর এই সযত্ন সংগীতশিক্ষা। পরে পাশ্চাত্য সংগীতের প্রতিও তৈরি হয়েছিল টান বিষ্ণু দে, নীরদ চৌধুরী, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে! কিন্তু গান গাওয়াকে মাথা থেকে সরিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র এলেন লিখতে, তাঁর সময় তাঁর ওপর ভয়ানক প্রভাব ফেলল, তাই। লিখলেন বেশিরভাগই গান, কবিতাও যথেষ্ট, কারণ কবিতার প্রতিও ছিল আশ্চর্য দুর্বলতা। অবশ্য গানও গাইতেন, শেখাতেনও সহকর্মীদের, সুর দিতেন অন্যের লেখায় আবার সঙ্গীত পরিচালনাও করেছিলেন বেশ কিছু ছবিতে।

বাবার সূত্রে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রভাব যথেষ্টই ছিল জ্যোতিরিন্দ্রর জীবনে। তবে পাবনা থেকে কলকাতায় আসার পর, বলা ভালো, সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি হবার পর তাঁর জীবনের মোড়, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার সূত্রে, ঘুরে যায় অন্যদিকে। ১৯৩০-'৩৫ এই পাঁচ বছরের মধ্যে সুশোভন সরকার, বিষ্ণু দে, নীরেন্দ্রনাথ রায়ের সান্নিধ্যে এসে মার্কসবাদী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হন জ্যোতিরিন্দ্র। কলকাতা শহরে তখন যেসব মার্কসিয়ান স্টাডি সেন্টার গড়ে উঠছিল, যুক্ত হয়ে যান তিনি সেগুলির সঙ্গে। ১৯৪২ এ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ওই বছরই ফ্যাসিস্ট বিরোধী শিল্পী ও লেখক সংঘে যোগ দেন। কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত ওঁর কাব্যগ্রন্থ 'মধুবংশীর গলি' প্রগতি সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। নানা অনুষ্ঠানে শম্ভু মিত্র অন্যান্য কবিতার সঙ্গে 'মধুবংশীর গলি' আবৃত্তি করে যশ লাভ করেন। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছিল, তখন কমিউনিস্ট পার্টির সদ্য প্রকাশিত 'স্বাধীনতা' দৈনিক পত্রিকাটির সাহায্য তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য শম্ভু মিত্রর 'মধুবংশীর গলি' আবৃত্তিকে ব্যবহার করা হত। উপস্থিত শ্রোতারা সবাই মিলে চাঁদা তুলে তহবিলে জড়ো

করার পরই শম্ভু কবিতাটি আবৃত্তি করতেন। কখনওই এমন হয়নি, তিনি কবিতাটি আবৃত্তি না করে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে নেমে যেতে পেরেছেন। উদ্ধৃত করা যাক, নবপ্রভাতের স্বপ্নে বিভোর এই কবিতাটি, যেমনটি ছিল 'নবজীবনের গান'ও-

শোনো শোনো তাই
হে নবীন, হে প্রবীণ, মজদুর, ওহে কৃষাণ,
ওহে মোটাসোটা বেঁটে খেটেখাওয়া কেরানীদল,
হে কাব্যে পাওয়া পলাতক ক্ষীণ কবির দল,
শিল্পীর দল,
হে ধনিক, আর্য, অনার্য
করো শিরধার্য-
বৃদ্ধযুগের গলিত শবের পাশে
প্রাণকল্লোলে ঐ নবযুগ আসে। ..

পড়া যেতে পারে এই জায়গায় 'নবজীবনের গান'। এটি একটি অপেরা বলা চলে। তিনটি পর্বে ভাগ করা গোটা আলেখ্যটি। প্রথম থেকে সপ্তম –এই সাতটি দলের অজস্র কথোপকথনের ভেতর সবচেয়ে কম সংখ্যক সংলাপ বা গান ব্যবহার করে মোটামুটি বক্তব্যটি বোঝানোর চেষ্টা করা যেতে পারে-

তৃতীয় দল : ফেন দাও ফেন দাও।
নবজীবনের সমীরণ চোখে মুখে ছড়াও।
গ্রাম ভেঙে আজ এসেছি শহরে
এনেছি দুঃখ,
এনেছি মৃত্যু,
এনেছি রোগ,
এনেছি শোক,
ছেঁড়া থলি ভরে ভরে।
অন্ন দাও বস্ত্র দাও,
আমাদের মরা বাছাদের এনে ফিরিয়ে দাও।

দ্বিতীয় দল : কি করে ফিরাব তাদের
মন্ত্র নেই তো মরা বাঁচাবার।
ক্ষুধা তীর্থের যাত্রীরা

তোরা ফিরে যা।
তোরা গ্রামের পথেই ফিরে যা।
হবে না তো কিছু এতে,
কি হবে ক্ষুধায় মেতে?
সোনা ফেলে কেন দিয়েছিস
গেরো আঁচলে। ...

তৃতীয় দল : ও শহরের বন্ধু রে
ঘরের বার করল দেখি আমারে।
নির্দয় এই বন্যা এলো
মাঠ-পোড়ানো আকাল এলো গো।
আর যা ছিল মাঠের সোনা
দস্যু এসে লুটলো রে।
ঘরের বার করল দেখি আমারে।
মরীচিকার ফাঁদে পড়ে
এখন মরি শহরে।
ঘরের বার করল দেখি আমারে।

প্রথম ও আমরা আছি কাছাকাছি
দ্বিতীয় দল : ভয় কি তোদের?
যা গেছে তা গেছে রে- ভয়
নেই তো মোদের।
আমরা সবাই লড়ছি,
যে যার মতো গড়ছি,
গ্রামের বন্ধু মরলে কোথায়
ভরসা মোদের।
শত্রু প্রবল হলে ততই
মারব ওদের।...

সকলে : (এসো) হাত লাগাই হাত লাগাই হাত লাগাই
ভেঙে পড়া গ্রামে প্রাণের দুর্গ ফিরে বানাই।
কুমোরে ছুতোরে চাষীতে তাঁতীতে
জেলেতে মাঝিতে হাত লাগাই।
প্রহরী যে মোরা প্রাণের দুর্গে কারে ডরাই?

ভেঙে পড়া গ্রামে প্রাণের দুর্গ ফিরে বানাই। (এই পর্যন্ত প্রথম পর্ব)

দ্বিতীয় দল : আবার দেখেছ আবার শুনেছ কি,
গান ছিঁড়ে ছিঁড়ে উঠে আসে পথে কঙ্কালসার ধ্বনি।
পারবে না কি এ দুর্ভিক্ষেরে ঠেকাতে?
শকুনির মেঘে ছেয়ে গেছে এ আকাশ
লোলুপ চঞ্চু শাণিত বিজুলি হানে।
ভুলো না কিছুতে ভুলো না
কঠিন কর্মপন্থা চপল গানে।

পারব ঠেকাতে পারব,
ধরব চোর, ধরব চোর, ধরব।
পালাবে কি তারা লভ্যের আড়ালে?
দুর্ভিক্ষের দূত এরা মৃত্যুর।
যারা শবের বুকের উপরে চালায়
অমিত লাভের নৃত্য।...

সকলে : এবার মোরা ঠিক করেছি
সবাই মিলে যুঝব।
নিজের গণ্ডি পেরিয়ে আমরা
পরস্পরকে বুঝব।
অনেক দুঃখ, অনেক মৃত্যু, বহু লাঞ্ছনা পেরিয়ে
মহামারীর ওই চিতাবহ্নিকে এড়িয়ে
নূতন রাজ্য গড়ব। ... (এই অংশ দ্বিতীয় পর্বের)

তৃতীয় দল : ওই বুঝি প্রভাতের প্রথম আলোর চূড়া দেখা যায়।
তবু দেখো যেতে হবে দূর-
পথ হবে খুব বন্ধুর...

পঞ্চম দল : শুনেছি শুনেছি শুনেছি সে তো গান।
আমরা বাঁধব কি সে সুরে মোদের প্রাণ?
এ কি শুধু মিছে ছলনারই আহ্বান?

প্রথম দল : নয় নয় এ তো ছলনা নয়, বাঁধন ছিঁড়েছে ওই

শিকল ভাঙার আর্তনাদ কি শুনি। ...

সমবেত : অসহ্য অসহ্য অসহ্য!
ভেঙে ফেলো ভেঙে ফেলো
ভেঙে ফেলো এই কারা।
শত পাকে ঘিরে বাঁধে নিষ্ঠুর লৌহ,
তবু প্রাণ পাক ছাড়া।
শুনেছি আকাশে মুক্ত পাখির গান
শুনেছি আকাশে ঝড়ে ঠাসা মেঘে
বজ্রের স্বরলিপি।
খণ্ড খণ্ড করে ফেলো বিধিলিপি।
(মোদের) পারবে না আর, পারবে না আর বাঁধতে।
ভাঙো ভাঙো ভাঙো
ভেঙে ফেলো এই কারাগার।
প্রাণ কল্লোলে গরজে মুক্তি পারাবার। (এখানে তৃতীয় পর্বের সমাপ্তি)

জ্যোতিরিন্দ্রের লেখালেখি বা সুর নিয়ে সামগ্রিক মূল্যায়নের আগে ওঁর বাকি সাংগীতিক কাজকর্মের খোঁজ নেওয়া যাক।

১৯৩০ র দশকে পদ্মার ভাঙন রোধ উপলক্ষ্যে রচিত গান, পাবনার বন্যার্তদের ত্রাণে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রচিত- এর কথা জানা যায় কেবল তথ্য হিসেবে।

১৯৪০ এর দশকের গোড়ায় রচনা করেন 'আমরা সবাই মিলেছি হেথায়' গানটি, যেটি নবগঠিত গণনাট্য সংঘের সংঘসংগীত ছিল। পরে '৪৫ সালে 'এসো মুক্ত করো' রচিত হবার পর অবশ্য 'আমরা সবাই' গানটি আর গাওয়া হত না।

১৯৪৩ : 'মিছিলের গান' রচনা করেন। জ্যোতিভূষণ চাকী জানিয়েছিলেন, ট্রাম শ্রমিকদের হাসপাতাল নির্মাণের অর্থ সংগ্রহের জন্য লেখা হয়েছিল এই গান। এর মহড়া হত দেবব্রত বিশ্বাসের বাড়িতে। সংরক্ষণের অভাবে এই গানগুলির সুর আজ লুপ্ত।

১৯৪৩ : 'ঝঞ্ঝার গান' এর রচনা।

১৯৪৩ : 'গাজন' লেখেন। এই গানে তিনি পুরাণের কাহিনিকে সমকালের প্রেক্ষিতে হাজির করেছেন। আগ্রাসী শাসককে অসুর ও শিব-দুর্গাকে গণশক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন

১৯৪৪ : 'আর দেব না, আর দেব না সোনার মণিপুর' জাপান কোহিমা আক্রমণ করলে এই গানটি রচিত হয়।

১৯৪৫ : রচিত হয় 'এসো মুক্ত করো'র মত কালজয়ী গণসংগীত। গানটির পরিচয় 'শিল্পীদের গান' নামে। স্মরণে থাকার কথা, ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'কোমল গান্ধার' ছবিটির সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব ছিল জ্যোতিরিন্দ্রের, সেই ছবিতেও ব্যবহার করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র এই গান-

এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো অন্ধকারের এই দ্বার।
এসো শিল্পী, এসো বিশ্বকর্মা,
এসো স্রষ্টা, রস রূপ মন্ত্র দ্রষ্টা,
ছিন্ন করো, ছিন্ন করো,
বন্ধনের এ অন্ধকার।
দিকে দিকে ভেঙেছে যে শৃঙ্খল,
দুর্গত দলিতেরা পায় বল।
এ শুভলগনে আজ
তোমায় স্মরণ করি রূপকার।
এসো মুক্ত করো হে এই দ্বার।
উঠেছে যে জীবনের লক্ষ্মী
মৃত্যু সাগর মন্থনে।
নূতন পৃথিবী চায় শিল্পীর বরাভয়
নবসৃষ্টির শুভক্ষণে।
এসো শ্রমিকের সাম্য ও ঐক্যে,
এসো জনতার মুখরিত সখ্যে।
এসো দুঃখ তিমির ভেদি দুর্গম ধ্বংসে,
মৃত্যু আঘাত করি চূর্ণ।
এসো প্রাণের আধার করি পূর্ণ।

১৯৪৫ : 'স্বাধীনতা দিবসের গান' লেখা হয়। কথাগুলি এরকম- "ওঠো আজি ঐ আহ্বান আসে দিকে দিকে/ মুক্তির আশা গগনে গগনে উড়ায় কেতন/ নব জাগরণ ঊষায় কেহ কি রহিবে অচেতন?/ ভাঙো আলস্য-দুর্গ দুয়ার চারিদিকে। ..."

১৯৪৬ : তেভাগা আন্দোলনের জন্য লেখেন 'মাঠের সৈনিক' গীতিগুচ্ছ।

১৯৬৮ : উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণের জন্য রচনা করেন 'প্লাবনের গান'। গানটি দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্যপুষ্পভরা' অবলম্বনে লেখা- "ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা/ সোনার স্বপ্ন দিয়ে গড়া দেশ গিয়েছে ভেসে।/ এখন দুঃখ মরণ হাহাকার/ ওই আকাশতলে মেশে। ..."

১৯৭১ : ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'আমার লেনিন' তথ্যচিত্রের জন্য একাধিক গান বাঁধেন জ্যোতিরিন্দ্র। ছবির শীর্ষসংগীতটি ছিল এরকম- "লেনিন লেনিন লেনিন লেনিন/ নূতন আশা নূতন এ দিন/ নূতন আকাশ, নূতন আলোর এ দিন আমার।/ পায়ে পায়ে, গায়ে গায়ে, লেনিন লেনিন/ মিছিল এ দেশ এগোয় ডায়ে বাঁয়ে-/ এ দেশ আমার, এ ক্ষেত আমার/ আমরা আমরা লেনিন লেনিন..."

১৯৭১ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য রচনা করলেন "বাংলার গান আজ আকাশে, আগুনরাঙা মেঘে" গানটি।

গীতিকার জ্যোতিরিন্দ্রের পরিচয় এর অধিক মেলেনা সেরকম। তবে চল্লিশের দশকের বিখ্যাত 'রাহুমুক্তি' যাত্রাপালায়, রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' গানে, রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা'য়, বিষ্ণু দে-র 'স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ' কাব্যগন্থে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য'- তে সুরারোপ, তাঁর সাংগীতিক কাজের মধ্যেই ধর্তব্য একই সঙ্গে 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার' এর মত বেশ কিছু চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা।

এইবার কয়েকটি বিষয় মনযোগ দিয়ে লক্ষ্য করার।

আলোচনা সূত্রেই জানা গেছে, বাড়িতে বরাবর একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল পেয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র, উচ্চবিত্তই বলা চলে তাঁর পরিবারকে, সেখান থেকে বেরিয়ে, পড়তে আসেন তিনি কলকাতার চাকচিক্যে ভরা, নামী কলেজ সেন্ট জেভিয়ার্সে। এই ঘটনাগুলি ওঁর 'ক্লাস' কে বোঝায় নিশ্চয়ই। তারপর যে তাঁর মার্কসবাদে দীক্ষা নেওয়া, নিপীড়িত মানুষের জন্য

তৈরি হওয়া মমত্ববোধ থেকে; কবিতা, গান লেখারও শুরু- প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক, কোন্ কৃষক, কোন্ শ্রমিক পড়েছেন তাঁর 'মধুবংশীর গলি'? তা বলে তাঁর লাঞ্ছিত, অবহেলিতদের জন্য লড়াই করার মনকে ছোট করা হচ্ছে না! কেবল, বলতে চাওয়া হচ্ছে এই, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বা তাঁর মত অনেক 'বিখ্যাত' গণসংগীতকার 'বিখ্যাত' থেকে গেছেন রবীন্দ্রনাথ পড়া, রবীন্দ্রনাথ শোনা, মার্কসের তত্ত্ব-ঘাঁটা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানুষের কাছেই। "শুনেছি আকাশে মুক্ত পাখির গান/ শুনেছি আকাশে ঝড়ে ঠাসা মেঘে/ বজ্রের স্বরলিপি"- এই ভাষা কি শ্রমিক বোঝেন, না কৃষক বোঝেন? 'নবজীবনের গান' যখন সুর করলেন জ্যোতিরিন্দ্র, কোথাও প্রয়োগ করলেন ইওরোপীয় মার্চিং সং এর সুর, কোথাও পূরবী রাগ, কোথাও কেদার, কোথাও বা মালকোষ। বিভিন্ন ছবির সঙ্গীত পরিচালনার সময় বারবার ফিরে গেলেন রবীন্দ্রনাথের গানে। নিজের সংগীতে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ তাঁর সর্বজনবিদিত। এই যে ক্ল্যাসিকাল সাংগীতিক বোধ, তাঁকেই আঁকড়ে ধরে থাকলেন তিনি সারাজীবন। লোকের সঙ্গে মিশলেন বটে, কিন্তু 'লৌকিক' গীতিকার হয়ে ওঠা হলনা জ্যোতিরিন্দ্রের।

জ্যোতিরিন্দ্র সম্পর্কিত আলোচনায় ইতি টানা যেতে পারে এই বলে যে, গণসংগীত নিয়ে উৎসাহী যাঁরা, যাঁরা পড়াশুনো করেন, চর্চা করেন, তাঁরা নিজেরাও বেশিরভাগই ওই মধ্যবিত্ত চেতনার বলে জ্যোতিরিন্দ্র, সলিলকে সবচেয়ে ভালো গানের স্রষ্টা হিসেবে জনপ্রিয়তার প্রথম সারিতে রেখে থাকেন। তাঁরা সেখানেই থাকুন। কারণ সেটাও একটা দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু আরেক দৃষ্টিভঙ্গীও আছে, যেখানে তাঁরা লোকপ্রিয়তার প্রথমদিকে না ও থাকতে পারেন! গরীব চাষার ভাষায়, তারই চেনা গেঁয়ো সুরে, তারই যন্ত্রণার কথা লিপিবদ্ধ করা গান জনপ্রিয় হতে পারে বেশি; আর সেই দিকটাও খেয়াল রাখা জরুরী।

- হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৯১২-১৯৮৭)

আত্মকথার একেবারে গোড়ায় লিখেছিলেন শ্রী বিশ্বাস তাঁর নিজের গ্রাম মিরাশী সম্বন্ধে-

মিরাশীর দুই ভাগ ছিল, পুব মিরাশী- পচ্ছিম মিরাশী। মাঝখানে ধানের হাওর। কোনাকুনি পথ- আঘন মাসে ধানকাটা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই খোঁচা খোঁচা দাড়ির মত মাঠভরা নাড়ার ছুঁচোলো মাথাগুলো পায়ে পায়ে দলে চাষীদের সঙ্গে আমরা স্কুলযাত্রী ছেলেরা পথ ফিরতাম। যেন সুতো দিয়ে মাপা, এমনি সোজা নাড়া-ভাঙা পথ। পায়ে জুতো নেওয়াটা তখন বিলাসমাত্র। তাই খালি পায়ে খোঁচা খেয়েও পথিকৃৎ হবার আনন্দ ছিল আমাদের। কোনাকুনি পথে সবাই চলতে চায়, যাকে গাঁয়ের বাবুরা

বলেন 'শট্-কাট্'। কিন্তু যখন বর্ষায় শালিধানের চাষের মাঠ হাল খেয়ে পাতা দইয়ের মতো থকথকে, তখন বাংলা দ-এর মতো ঘাসে ঢাকা সড়কটি দিয়ে না গিয়ে উপায় ছিল না। কোনাকুনি পথে আধ মাইল। সড়কে গেলে সওয়া মাইল। পুব মিরাশীতে লোকাল বোর্ডের রিজার্ভ শাপলা-ফোটা পুকুরের পাড়ে আমাদের মাইনর ইস্কুল। ইস্কুলে-পড়া জীবনটায় একদিকে অভিভাবক, অপরদিকে শিক্ষকদের যতই দাপট থাক না কেন, স্কুল যাওয়া-আসার পথের সাথী মাঠের মানুষগুলো চিরদিন পরমাত্মীয় হয়ে রইল।

শালিধানের মাঠ। আশ্বিন-কার্তিক মাসে সড়কের মাথার কাছে ঢেউ দুলিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ত ময়না-শাইল, কার্তিক-শাইল, কালিজিরা, কৃষ্ণচূড়া- কতরকমের ধান। কত বর্ণ, কত গন্ধ। ধানের শিষ টেনে কচি ধানের দুধ বার করে খেতাম। কোনো চাষি দেখলে বলতো-'ধানের বুকো অখন ক্ষীর, ছিঁড়ো না, পাপ হয়'। কত বৎসর পর, বাংলা দুভাগ হবার পর, কলকাতায় বসে এক ছিন্নমূল কবি আমি লিখলাম-

কার্তিক মাসে বুকে ক্ষীর খেতে ধানে ধানে
আঘ্রানে রান্ধুনি পাগল নয়া ভাতের আঘ্রাণে।

রান্ধুনি পাগল দুই অর্থে। এক জাতের ধানের নামও রান্ধুনিপাগল।

১৯১২, সাতাশে অগ্রহায়ণ, আমার জন্ম। অঘ্রানে আমাদের দেশ ভারি সুন্দর হয়ে ওঠে। ধানের দেশে বাড়ি

আমাদের- ধানের গন্ধে বড়ো হয়েছি। এই ধানই আমায় গান দিয়েছে।[৪]

এই অংশটি উল্লেখ করা হল এ কথা স্মরণ করাবার জন্য, হেমাঙ্গ বিশ্বাস নিজে কৃষক পরিবারের সন্তান না হলেও, তাঁর জীবনে শুরু থেকে কৃষকদের স্পর্শ ছিল। কৃষকদের কষ্ট, যন্ত্রণা নিয়ে যখন ভাববার বয়স অবধি হয়নি তাঁর, তখনো গ্রামের চাষীদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন তিনি, ধানকাটার গানের সুর সেভাবেই মনের গভীরে শিকড় বিস্তার করেছিল। প্রতিবেশীদের মধ্যে সবাই কৃষক প্রায়, ক্ষেত থেকে শসাটা, মুলোটা চুরি করলে মিলত কখনো মৃদু ধমক; কখনো দুষ্টুমি দেখে ফেললে পাড়ার 'ধান-ভানা মেয়ে' হেতিমের মা, হেমাঙ্গর মাকে বলে দেবেন বলে শাসিয়ে রাখতেন! এভাবেই, কৃষক, কৃষকের বৌ- চমৎকার আত্মীয়তার সূত্রে বেঁধে রেখেছিলেন তাঁর শৈশব, কৈশোর। এদের শ্রম লাঘবের গান, পার্বণে নাচ বা কারো বিশেষ কোন বাদ্যযন্ত্রের প্রতি ঝোঁক- এসব দেখতে দেখতে বড়ো হয়েছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। অর্থাৎ বলতে চাওয়া হচ্ছে এই, শহরে পড়াশুনো করে, সাহিত্যিক আড্ডা দিয়ে, তারপর হঠাৎ একদিন শহরের পথেঘাটে মন্বন্তরের বীভৎস চিত্র দেখে গরীব মানুষের জন্য গান লেখার প্রেরণা জ্যোতিরিন্দ্রের মত তিনি পাননি, গ্রামে থেকেই একদিন বুঝতে শিখেছেন এদের কষ্ট, কমিউনিস্ট পার্টির

ভাবাদর্শের সঙ্গে তাঁর দেখা মিলে গেছে বলে, সেই পার্টিরই ছত্রছায়ায় সাংস্কৃতিকভাবে এই মানুষগুলিকে নিয়ে কাজ করে গেছেন সারাজীবন।

আগেই জানা গেছে, ১৯১২ তে জন্ম হেমাঙ্গর। দিনটা ১৪ই ডিসেম্বর। আসাম প্রদেশের একটি জেলা শ্রীহট্ট বা সিলেট, তারই হবিগঞ্জ মহকুমার মিরাশী গ্রামে তাঁর পৈতৃক ভিটে। বাবা হরকুমার বিশ্বাস ছিলেন ছোট-খাটো জমিদার, তবু এলাকায় ছিল ভয়ানক দাপট। পরিবারে ছিল সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রাধান্য এবং জাতপাত ও বর্ণভিত্তিক বাছবিচারের কঠোরতা। অবশ্য মামাবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল তুলনামূলকভাবে অনেকটাই উদার। মা সরোজিনী বিশ্বাসের বাপেরবাড়ি ছিল বেজোড়া। সিলেট-ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী এই গ্রামটি ছিল সংস্কৃতির একেবারে কেন্দ্রভূমি। হেমাঙ্গর মাতামহ রাজমোহন চৌধুরী ছিলেন সেই অঞ্চলের নামকরা তবলিয়া। সেই সূত্রে আলাউদ্দীন খাঁ ও তাঁর দাদা আফতাবউদ্দীন খাঁর যাতায়াত ছিল ওই বাড়িতে। সরোজিনী নিজেও গাইতেন খুব ভালো। বিভিন্ন ধরণের মেয়েলি গান, রজনীকান্তের গান, শ্যামাসংগীত। কাজেই, কানে গান নিয়ে জন্ম হেমাঙ্গর। তাছাড়া নাকি "'রামগরুড়ের বাসা'য় মাঠের হাওয়া এসে ঢুকত মাঝে মাঝে।"[৫] কোনদিন আসত বৈষ্ণবী কোনো, চালের বদলে গাইত গান; কোনদিন বা আসত গাঁয়ের রাখাল ছেলেরা, পীর শা গাজীর সিন্নির চাঁদা নিতে, লাঠিগুলি মাটিতে ঠুকে ঠুকে সুর ছড়াত; চৈত্রমাসে গ্রামে আসত গাজনের দল; আসামের হোরী গীতের চনমনে সুরও নাড়া দিয়েছিল হেমাঙ্গকে; গ্রামে প্রায়শই হত যাত্রা, হবিগঞ্জে স্বদেশপ্রেমের অপেরা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন স্বয়ং মুকুন্দদাস; এছাড়া, হেমাঙ্গদের বাড়িতে একটা ঐতিহ্য ছিল কবিগান আয়োজনের- লোকসঙ্গীতের সার্বিক চেহারা এভাবে খুব ছোটবেলা থেকেই মিশে গিয়েছিল রক্তে তাঁর। এরই ফলশ্রুতি কী দাঁড়াল, যেতে হবে মূলত সেই জায়গায় আমাদের। তার আগে হেমাঙ্গর বাকি জীবনকথা, সংক্ষেপে।

হেমাঙ্গ পড়াশুনো করতেন জর্জ ইনস্টিটিউশনে। সেই স্কুলে পড়াকালীন বাবার নির্দেশে তাঁকে থাকতে হত ওঁবাবার আশ্রমে, কারণ আশ্রমের ধর্মীয় পরিবেশে থেকে পড়াশুনো করে ছেলে মানুষ হবে-এই ছিল হরকুমারের ইচ্ছা। কিন্তু নানা কারণে সেই আশ্রম হেমাঙ্গর কাছে ছিল অচলায়তনের মত, মন টিকত না। তারপর আশ্রমের বিবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি অভিভাবক হিসেবে হরকুমারেরও নজরে আসায় ক্লাস এইটের বার্ষিক পরীক্ষার পর আশ্রম ও জর্জ ইনিস্টিটিউশন থেকে ছাড়িয়ে এনে তিনি ছেলেকে ভর্তি করেন হবিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে। এই স্কুল থেকেই তিনি ১৯৩০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ওই বছরই

হেমাঙ্গ শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন, সমগ্র দেশ জুড়ে সেই সময় গান্ধীজীর নেতৃত্বে শুরু হয়ে গেছে আইনঅমান্য আন্দোলন। মুরারিচাঁদ কলেজেও সেই ঢেউ এসে লাগে, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণায় হেমাঙ্গও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ক্রমে খুব সক্রিয় হয়ে পড়লে একদিন 'রাষ্ট্রবিরোধী' কার্যকলাপের অপরাধে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ছয় মাস আটক থাকেন তিনি জেলে। মুক্তি পেয়ে ওই বছরই তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং প্রথমে নওগাঁ, পরে গুয়াহাটি জেলে আড়াই বছর বন্দীজীবন যাপন করেন। নওগাঁ জেলে বন্দী অবস্থাতেই যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার আশঙ্কাজনক অবনতি ঘটে। নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে জেল থেকে বেরনোর পর যাদবপুর টি বি হাসপাতালে ভর্তি হন হেমাঙ্গ এবং তিনবছর নিরবচ্ছিন্ন চিকিৎসার পর অনেকটাই সুস্থ হয়ে শিলং এ যান। শারীরিক অসুস্থতার এই দীর্ঘ পর্বেই তাঁর কমিউনিজম এ হাতেখড়ি। যুগে যুগে, দেশে দেশে মানুষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস, গোর্কির 'মা', মরিস হিন্ডুজের 'হিউম্যানিটি আপরুটেড' প্রভৃতি পড়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মনে কমিউনিস্ট হবার স্বপ্ন ও সংকল্প জেগে ওঠে। সেই সংকল্প নিয়েই ১৯৪৩ সালে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে যোগ দিতে নির্মলেন্দু চৌধুরীকে নিয়ে কলকাতায় আসেন তিনি, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সেই অনুষ্ঠানে নির্মলেন্দুর নেতৃত্বে গান "কাস্তেটারে দিও জোরে শান"। সেইবারই পরিচয় হয়ে যায় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, পার্টি সেক্রেটারি পূরণচাঁদ যোশী, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখের সঙ্গে। আসামে ততদিনে গঠন করে ফেলেছেন তিনি 'সুরমা ভ্যালি কালচারাল স্কোয়াড'। কলকাতা থেকে সিলেটে ফিরে তৈরি করেন শ্রীহট্ট জেলা গণনাট্য সংঘ, জ্যোতিপ্রকাশ আগরওয়াল যার সভাপতি, হেমাঙ্গ বিশ্বাস সাধারণ সম্পাদক। এরপর ১৯৪৮ এ কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস আত্মগোপন করেন। পরের বছর এলাহাবাদে গণনাট্যের সর্বভারতীয় সম্মেলনে পুলিশ গুলিচালনা করলে আত্মগোপন করেন ফের, পরে গোপনে কলকাতায় চলে আসেন। এরপর আসাম গণনাট্য সংঘ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন প্রায় বছর পাঁচেক। ১৯৫৭ তে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে চিনযাত্রা করেন। ১৯৬১ তে সোভিয়েত কনসালেটে চাকরি নেন, ১৯৭৪ এ যদিও সে চাকরিতে ইস্তফা দেন! ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়টা বেশ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে কাটিয়েছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, কারণ ততদিনে কমিউনিস্ট পার্টিতে বিভাজন ঘটে গেছে এবং তিনি কোনো পক্ষই নেননি। ইতিমধ্যে চলে আসে ১৯৬৭, নকশাল আন্দোলন শুরু হয়, নকশালপন্থীদের একরকম সমর্থনই জানান তিনি। ১৯৭০-৭১ নাগাদ নিজের গানের দল 'মাস সিঙ্গার্স' গঠন করেন। '৭৮ এ ফের একবার চীনে যান। ১৯৮৩ এ অসমিয়া-বাঙালি বিরোধে আসাম যখন

উত্তপ্ত, তখন সাংস্কৃতিক অভিযানের উদ্দেশ্যে যদিও আসাম যান হেমাঙ্গ, তবু সফলতা আসেনি। ১৯৮৫ তে গণনাট্য সংঘ বিলুপ্তই বলা চলে, তবু নিজের গানের দলের সঙ্গীদের নিয়ে তা পুনর্গঠনের শেষ চেষ্টা করেন তিনি, বলাই বাহুল্য এতেও তেমন সাড়া মেলেনা। এরপর ফুসফুসের দুর্বলতা মারাত্মক আকার নিলে ১৯৮৭ তে কলকাতা এস এস কে এম হাসপাতালে ভর্তি হন ও সেখানেই মৃত্যু ঘটে তাঁর।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানের সঙ্গে যেহেতু ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রাজনীতি, তাই তাঁর রাজনৈতিক মনোভাব ও ক্রিয়াকলাপের পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে তাঁর জীবনের রূপরেখাটি প্রস্তুত করার পর এখন তাঁর 'গান' বিষয়েই ধ্যান দেওয়া উচিৎ হবে আমাদের। হেমাঙ্গ বিশ্বাস আক্ষেপ করেছেন, মাঠে, ঘাটে প্রান্তরে গাইবার পর বহু গান তাঁর হারিয়ে গেছে, কেউ হদিস রাখেনি; তবু যা বেঁচে আছে তার সংখ্যা প্রায় দু'শো। যদিও বর্তমানে তার অর্ধেকের চেয়েও কম গান মেলে, তিনটি গানের বই মিলিয়ে। বইগুলি-

- বিষাণ (প্রকাশ : ১৯৪৩) (মোট গান ৩৩ টি)
- শঙ্খচিলের গান (প্রকাশ : ১৯৭৫) (মোট গান ১৯ টি)
- হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান (প্রকাশ : ১৯৮০) (মোট গান ৩৮ টি)

শৈশব-কৈশোর জুড়ে নানাবিধ লোকসঙ্গীতের আবহের মধ্যে বেড়ে ওঠা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সারাজীবনের সংগীতভাবনাকে প্রভাবিত করেছে। এরপর যখন তিনি নওগাঁর জেলে বন্দী, সেখানে আলাপ হয় সেযুগের কংগ্রেস নেতা, সহবন্দী বিমলাপ্রসাদ চালিহার সঙ্গে, যিনি পরে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। সংগীতপ্রেমী ও সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী বিমলাপ্রসাদের কাছেই হেমাঙ্গ বিহু সম্বন্ধে ও আসামের বিভিন্ন প্রদেশের লোকসংগীতের বহুমুখী রূপ সম্বন্ধে বিস্তৃত ধারণা পান। সবে মিলে ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বিহু, সারি, জারি, চটকা, ঝুমুর, বাউল, ভাদু, টুসু, ঘুমপাড়ানি, বিয়ের গান, হোরী, কবিগান- এসব ধরণের লোকগানের অধীশ্বর হয়ে ওঠেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। ক্রমে যখন মানুষের জন্য গান লিখতে আসেন, লেখেন একের পর এক সার্থক গণসংগীত, সুরের জন্য হাত পাতেন ঐ চেনাজানা লোকসংগীতগুলির কাছেই, অকারণে নয়, তাঁর যুক্তি ছিল, যাঁদের জন্য এসব গান লেখা, তাঁদের জীবনের সঙ্গে মেলানো সুরে, তাদের জীবনের সঙ্গে মেলানো ছন্দেই বাঁধতে হবে গান, না হলে তারা সংযোগ করতে পারবে না কোনদিন। এ যুক্তি অকাট্য,

এবং আমাদের মতে এমনটাই সঠিক সিদ্ধান্ত আর এখানেই তিনি আমাদের লেখায় পূর্বালোচিত জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের থেকে পৃথক হয়ে যান।

কীরকম চেনা সুরের মাধুর্যে তৈরি করেছেন বৈপ্লবিক সব গান, তার একটা নমুনা দিয়েছেন আত্মজীবনীতেই হেমাঙ্গ বিশ্বাস-

> আমাদের পূর্ববঙ্গের সমস্ত সুরের ধারার মধ্যেই দুঃখের একটা অন্তর্লীন প্রবাহ আছে। ব্যতিক্রম শুধু এই উজ্জ্বল হোরী গীত। এ কথায় মনে পড়ল বাংলার মন্বন্তরের গানের কথা। 'তোমার গান খালি দুঃখের'- অনেকে বলত এ কথা। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, আসামে যিনি তত্ত্বাবধানে ছিলেন আমাদের, জোর দিয়ে বললেন- ক্যাম্পেনে গাওয়া তোমার গানগুলি একঘেয়ে, খালি কান্না- মানুষকে জাগানো যায় না। বীরেশ মিত্র, বারীন দত্ত, লালাবুলি প্রমুখ জেলা-নেতারাও আমার গানে 'কাঁদুনে ধারা'র সমালোচনা করেছেন। আমি তখন সুর খুঁজে পেলাম আমাদেরই tradition থেকে- হোরীর সুর। সেই সুরে লিখলাম- বাঁচব রে বাঁচব / ভাঙা বুকের পাঁজর দিয়ে নয়া বাংলা গড়বো...[৬]

উল্লিখিত গানটির কথাগুলো খেয়াল করা যাক এখন। গানটির রচনাকাল ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ।

বাঁচব বাঁচব রে আমরা বাঁচব রে বাঁচব
ভাঙা বুকের পাঁজর দিয়া
নয়া বাংলা গড়ব।
বিভেদ গাঙের বাঁধব দুই কুল
বাঁধব আবার মিলনের পুল
যত বাস্তুহারা সর্বহারা সুখের গৃহ গড়ব।
ঘুচবে দেশের অন্ধকার
আসবে রে প্রাণের জোয়ার
(আমরা) সবাই মিলে তালে তালে আনন্দের গান গাইব।
গোলায় গোলায় উঠবে ধান
গলায় গলায় উঠবে গান
যত মায়ের বুকের শিশুর মুখে হাসির ঝলক আনব।
দীন-দুঃখী অভাগার দল
মোছ রে এবার চোখের জল
এল নিখিল বিশ্বে যত নিঃস্বের মহামুক্তির পর্ব।

গানটির আর যে কোনো গীতিকারই লিখতে পারতেন! হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নিজস্বতার কোন ছাপ এ গানের 'কথা'য় নেই। কিন্তু যখন গানটি শোনা হয়, সুরটা শুনে সত্যিই চমক লাগে! হোরীর সুর, সঙ্গে কোরাস, প্রচলিত গণসংগীতের ধরণের থেকে একেবারেই আলাদা। এই জায়গাতেই হেমাঙ্গ বিশ্বাস অনন্য, আর এটিই আমাদের মূল বলবার কথা। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গণসংগীত সেভাবে ক্যাসেটবন্দী হয়নি, মধ্যবিত্ত মানুষ বড়জোর তাঁর নামটুকু জানেন, বা 'মাউন্টব্যাটন', 'শঙ্খচিল' এর মত দু'একটা গানের নাম, কিন্তু গণনাট্যের কালে সুরের প্রভাবেই তাঁর গান লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত, লাঞ্ছিত জনের হৃদয় স্পর্শ করেছিল, এ কথা বহু মানুষ বলে গেছেন।

খালেদ চৌধুরী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'বিষাণ' এর প্রচ্ছদপট এঁকেছিলেন। গণনাট্যেই উভয়ের আলাপ। খালেদ চৌধুরী গানও গাইতে পারতেন বলে আলাপ তাঁদের আরো ঘনিষ্ঠ হয়। কীভাবে হেমাঙ্গ বিশ্বাস লোকসংগীত থেকে তাঁর গানের উপাদান সংগ্রহ করতেন সে নমুনা হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে নিয়ে একটি লেখায় তিনি দিয়েছেন-

> ১৯৪৪ সালের কোনো এক সময়, বোধ হয় শেষের দিকে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সিলেটে গিয়েছিলেন প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে। তাঁকে খাঁটি লোকসংগীত শোনানর জন্য গ্রাম থেকে একজন শিল্পীকে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেই শিল্পী যুদ্ধের সময় আকাশে এরোপ্লেনের অহরহ ওড়াউড়িতে আতঙ্কিত হয়ে গান গাইলেন-
>
> একি লীলা আজব খেলা কুনোযুগে শুনছনি
> সজনি
> জগৎজুড়ি উড়ুরপলইন দেখছনি।
>
> হেমাঙ্গদা ১৯৬৪ সালে যখন সর্ষের তেলের সংকট দেখা দেয় তখন একই সুরে এবং প্রথম লাইনটি অবিকৃত রেখে লিখলেন :
>
> আজব দেশের আজব লীলা আজবখেলা কোনো যুগে শুনছনি সজনি।
> হইবর তেল কোন দেশে গেল খবর জাননি।[৭]

শ্রীহট্টে সর্ষের তেলের যোগান কম হলে একদিন এক কৃষক কমরেড এই বিষয়ে গান লিখতে অনুরোধ করলে, খানিক দ্বিধা করবার পর হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছিলেন এই গান, সম্পূর্ণ সিলেটি ভাষায়। সুরের সঙ্গে সঙ্গে এখানে ভাষা ব্যবহারও হয়ে উঠেছে গানের মূল বক্তব্যের সহকারী। গানের প্রথম স্তবকের বাকি কথাগুলি এরকম :

> দিল্লিশ্বরের ধলা বাদশা ফরমান করিলা
> দরবেশী নাচ নাচবা তাইন্ হক্কলরে জানাইলা

কত দাওয়াত ভেজিলা
মরি হায়, হায় হায়, হায় রে
হাজার মন তেল পুড়িব দেখতে রাজার নাচুনি।

কী তীব্র শ্লেষ! এই জায়গায় একটা কথা বলবার, গণসংগীত চরিত্রের দিক থেকে বরাবরই সিরিয়াস, কিন্তু ব্যাঙ্গের আবডালে ওই সিরিয়াস কথা বলার ধরণ সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস অসামান্যভাবে দেখিয়েছেন বরাবর। উপরের গানটিই যেমন। আরেকটি গান মাউন্টব্যাটনের মহাকাব্য। স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস শাসনে ভারতের অবস্থা দেখে হতাশ হেমাঙ্গ লিখেছিলেন, যে গান নাগরিক-সমাজে জনপ্রিয় করেছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস-

মাউন্টব্যাটন সাহেব ও
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও!
তোমার সোনার পুরী আন্ধার কইরা ও ব্যাটন সাহেব
তুমি কই চলিলায়,
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও।
সর্দার কান্দে, পণ্ডিত কান্দে, কান্দে মৌলানায়!
কি রে হায়, হায়, হায়।

এতক্ষণের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানে বিষয় বৈচিত্র ও আঙ্গিক বৈচিত্র যথেষ্ট। আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বিষয়-বৈচিত্রের কথা বলা যাক। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে লেখা গান –"জাগো, দুঃখের রাতের ঘোর তমসা ভেদি/ স্বাধীনতা দিবস এল যে ফিরে।"; ফসল কাটার গান-"তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান, কিষাণ ভাইরে"; দুর্ভিক্ষের গান- "হায় হায়, ঘোর কলিকাল আইল আকাল/ সোনার বাংলায়।"; জাপানবিরোধী গান-"ওরে ও চাষি, ভাই-/ তোর সোনার ধানে বর্গী নামে দেখ রে চাহিয়া।/ তুই আর কতকাল রইবি ঘুমে ওঠ রে জাগিয়া।";ফসল বাড়ানোর গান "লাঙল চালাই আমরা কোদাল চালাই/ নাচের তালে তালে ফসল বাড়াই"; ধর্মীয় সম্প্রীতির গান- "তোরা আয়, আয় রে ছুটে আয়/ এ ভারতের হিন্দু-মুসলমান কে আছো কোথায়,"; রেলমজদুরের গান-"দেশকে রক্ষা করনেওয়ালা/ আমরা রেল মজদুর/ বয়লার চালাই ইঞ্জিন চালাই/ চালাই জোরে জোর"; শান্তির জয়গান-" সুদূর সমুদ্দুর-প্রশান্তের বুকে/ হিরোশিমা দ্বীপের আমি শঙ্খচিল/ আমার দুডানায় ঢেউয়ের দোলা/ আমার দু'চোখে নীল শুধু নীল"; সেনাবাহিনীর গান-"সৈনিক, মুক্তিশিবিরে হাঁকে বিউগল/ আহ্বান শোনো ঐ সেনানীর"- এরকম আরো কত-শতই না আছে। এছাড়াও উল্লেখ করা যেতে পারে অনূদিত

কিছু বিখ্যাত গানের, যেগুলি গণসংগীতকার হিসেবে অনুবাদ করা হেমাঙ্গ বিশ্বাস দায়িত্ব বলে মনে করেছেন এবং এই অনুবাদের মাধ্যমে একজন সংগীতজ্ঞ হিসেবে নিজের মান তিনি আরো উচ্চে নিয়ে গেছেন। গৃহযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্বপ্রান্তে যুদ্ধরত লাল পল্টনের একটি বাহিনীর অধিনায়ক কর্নেল আলেকজান্দ্রভ একটি লোকগীতির সুরে রচনা করেছিলেন একটি গান, যার বাংলা অনুবাদে নাম দাঁড়ায় 'পর্বত ও উপত্যকা পার হয়ে', সেই গানটি অনুবাদ ক'রে হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছিলেন- "ভেদি অনশন মৃত্যুতুষার তুফান/ প্রতি নগর হতে গ্রামাঞ্চল/ কমরেড লেনিনের আহ্বান/ চলে মুক্তিসেনা দল..."। আবার মাও এর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক লঙ মার্চের পর সেখানকার সদ্য শোষণমুক্ত এক ভূমিদাসের লেখা 'পুব দিক লাল' গানটিও অনুবাদ করেছিলেন হেমাঙ্গ-"পুবদিক লাল সূর্যের আভায়/ বিশ্বের শোষিতের মন রাঙায়/ সেই সূর্যের নাম মাও সে তুঙ/ হু আর হেইও-চিন্তা তার ছড়ায় আগুন..."। জন ব্রাউন, প্রথম দরিদ্র শ্বেতাঙ্গ বিপ্লবী, যিনি বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গ নরনারীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে প্রাণ আহুতি দেন, তাঁকে নিয়ে লেখা বিখ্যাত গণসংগীত বাংলায় আনেন হেমাঙ্গ, লেখেন- " জন ব্রাউনের দেহ শুয়ে সমাধিতলে/ তাঁর আত্মা বহ্নিমান/ শহিদের জয় জয় গান..." আর বলতেই হয় তাঁর অনুবাদে আমারিকার বিখ্যাত ব্যালাডধর্মী লোকসংগীত 'জন হেনরী'র কথা। মেশিনকে শ্রমিক তার জায়গা ছেড়ে দেবে না, এই ছিল রেললাইন-পাতা-শ্রমিক হেনরীর প্রতিবাদ। লোককথা অনুসারে, মেশিন আর জন হেনরীর কর্মক্ষমতা পরীক্ষা করা হলে জন হেনরী নিজেকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। মারা যান। সেই কাহিনী নিয়েই গাঁথা এই গান অনুবাদের পর দাঁড়ায় এরকম- "নাম তার জন হেনরী/ ছিল যেন জীবন্ত ইঞ্জিন/ হাতুড়ির তালে তালে গান গেয়ে শিস দিয়ে/ খুশি মনে কাজ করে রাতদিন.../ আমি মেশিনের হব প্রতদ্বন্দ্বী/ জন হেনরী বলে বুক ঠুকে/ স্টীম ড্রিলের সাথে চলে হাতুড়ির পাল্লা/ কে আর বলো তাকে রোখে। .../ প্রতি মে দিবসের গানে গানে/ নীল আকাশের তলে দূর/ শ্রমিকের জয়গানে কান পেতে শোনো ঐ/ হেনরীর হাতুড়ির সুর"।

লোকসংগীতের ফর্মগত বৈচিত্রের কিছু উদাহরণ দেওয়া গেছে। আরো দেওয়া যেতে পারে। যেমন, হবিগঞ্জের এক লোকশিলীর কাছে বাংলার দুর্ভিক্ষ নিয়ে একটি গান শুনেছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। গানটি- "দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গে/ দুঃখহরা নাম তোমার/ কী দুর্গতি ঘটালে এবার" এরকম; গানটি মূলত ভাটিয়ালি সুরে বাঁধা হলেও, কবিগানের বেশ প্রভাব ছিল তাতে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস ঠিক একই সুরে লিখেছিলেন "ক্ষুধানলে অঙ্গ জ্বলে গো/

মা গো পুড়ে হলেম ছাই/ আমি কুল ছাড়িলাম, মান বেচিলাম/ তবু দুঃখের অন্ত নাই"। ভাটিয়ালির কথা জানা সকলের, বিলম্বিত ভাটিয়ালিতে হেমাঙ্গ লিখেছিলেন-"আমরা তো ভুলি নাই শহিদ, সে কথা ভুলব না/ তোমার কইলজার খুনে রাঙাইলো কে আন্ধার জেলখানা"। আবার সিলেটের মেয়েলি ধামাইল এর ঢং এ লিখেছিলেন-"কী শুনি কী শুনি সই লো, কী শুনি কী শুনি/ হরিতে রমণীর মান আইল রে জাপানি, দেশে আইল জাপানি।" আবার বিহু-ভাটিয়ালির মিলিত সুরে ভূপেন হাজারিকার সঙ্গে মিলে রচনা করেছিলেন 'হারাধন রঙমন কথা'। পাশাপাশি চা বাগানের মজুরদের জন্য গান লেখার সময় ব্যবহার করেছেন তিনি সাঁওতালি সুর। এভাবেই অজস্র উদাহরণ দিতে দিতে, কী বিষয়ে, কী ফর্মে, কী সুরের ধরণে- সর্বত্র, বৈচিত্রের পর বৈচিত্রের দেখা মিলবে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানে। এত বৈচিত্রের উল্লেখ করার মাধ্যমে গণসংগীতকার হিসেবে তাঁর মান সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া চলে। আর গণচেতনার গানে লোকসুরের ব্যবহার- এই বৈপ্লবিক কাজের জন্য সে মান আরো বৃদ্ধি পায় নিঃসন্দেহে। যতটা জনপ্রিয়তা তাঁর প্রাপ্য ছিল, মধ্যবিত্ত সংগীতরসিক তা তাঁকে দেননি ঠিকই, কিন্তু খেটে খাওয়া মানুষের ভালোবাসা তিনি পেয়ে গেছেন বরাবর, এখানেই তাঁর জয়।

- নিবারণ পণ্ডিত (১৯১২-১৯৮৪)

'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক হিরণকুমার সান্যালের কাছ থেকে একটি 'সঞ্চয়িতা' উপহার পেয়েছিলেন নিবারণ পণ্ডিত, আর শুনেছিলেন শম্ভু মিত্রের মুখে রবীন্দ্রকবিতার আবৃত্তি। সেই থেকে রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসা শুরু। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে তাঁরই ভাষা অনুসরণ করে তিনি লিখেছিলেন এই গান-

আজি এই পুণ্যদিনে
গাঁয়ের কিষাণ
কি গাহিব গান
নাই ভাষা
দৈন্য হতাশায় মন ম্রিয়মাণ...
অজ্ঞতার অন্ধকারে আছি

কোটি কোটি পুরুষ রমণী
কেউ দেয় নাই জানি
তব বাণী দীপশিখাখানি
এদের সম্মুখে আনি।
হে কবি-
তোমার সোনার মাঠে
কে কাটিবে ধান
কে গাহিবে গান
কেউ রুগ্ন শুয়ে আছে।
কেউ গ্রাম ছেড়ে গেছে
কেউ ত্যাজিয়াছে প্রাণ
তোমার মাঠের রাজা
মরেছে কিষাণ।
হঠাৎ তোমার ডাক
কোন্ ফাঁকে পশিয়াছে কানে
"ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই"
তাই দলে দলে
যারা বেঁচে আছে তারা চলে।

কৃষকের মৃত্যুতে সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন গীতিকার রবীন্দ্রনাথের বাণীর ভিতর। এমন সে গভীর বাণী, যার আস্কারায় যারা বেঁচে আছে, তারাও দলে দলে চলে মরতে, নিবারণ পণ্ডিতের গানে। এই চেতনা একজন 'শিক্ষিত' মানুষের চেতনা নয়। একজন বিড়ি শ্রমিকের উপলব্ধ বিশ্বাস।

১৯১২ র ২৭ শে ফেব্রুয়ারি নিবারণ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার সগড়া গ্রামে। কৃষিনির্ভর পরিবার ছিল। তবে তাঁর বাবা ভগবানচন্দ্র পণ্ডিত তাঁর 'পণ্ডিত' উপাধি পেয়েছিলেন শিক্ষকতা করে। যখন নিবারণের বয়স বছর দশেক, তখন তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। দিশেহারা হয়ে পড়ে মা ও ছেলের পরিবার। এরপর পরপর কয়েক বছর অজন্মার কারণে দুজনের অনাহারই শুরু হয় একপ্রকার। তখন বিড়ি বেঁধে আয়ের চেষ্টা করতে থাকেন নিবারণ। কিশোরগঞ্জের রামানন্দ স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনো ক'রে পড়াশুনোয় ইতি টানতে বাধ্য হন। এদিকে বিড়ির ব্যবসা জমে উঠতে না উঠতেই

মহাজনের চক্রান্তে তা তুলে উঠে যায়। একটা গুণ ছোট থেকেই ছিল তাঁর; গ্রাম্য গান, কবিতা রচনায় পারদর্শিতা, আর এইজন্য গ্রামীন গায়ক-বাদকেরা সবসময়েই নিজেদের দলে নিতে চাইতেন তাঁকে। ক্রমে কিশোর বয়স থেকেই সংগীতরচনায় সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন নিবারণ, বিশেষত তাৎক্ষণিক কবিপ্রতিভার অধিকারী হওয়ায় প্রশ্নোত্তরমূলক গানের আসরে তাঁর মূল্য বাড়তে থাকে। পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে দৈনন্দিন জীবন যন্ত্রণা। ছোটবেলায় গান লেখার মোহে পড়ে অধিকাংশই লিখেছিলেন প্রেম আর ভক্তিরসের গান। সেগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল। কিন্তু যত মানসিক বিকাশ ঘটতে থাকে, নিজের লেখায় রোজকার বাস্তবকে এড়িয়ে যেতে পারেন না আর তিনি। একশ্রেণির মানুষের প্রতি আরেক শ্রেণির মানুষের নির্যাতন, পীড়ন দেখে দেখে মনের ভিতর তাঁর তৈরি হতে থাকে প্রবল ক্ষোভ। তখন নিজের গানকেই করে তোলেন সেই ক্ষোভপ্রকাশের মাধ্যম। দুর্নীতিপরায়ণ মানুষের স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টায় ব্যাকুল যখন তিনি, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ গড়ে ওঠে। ক্রমে তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, বাস্তব জগত আর সামাজিক পরিকাঠামোর অভ্যন্তরেই যত দুর্নীতি, অনাচার, মানবের অবমাননা; আর এরই মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানবমুক্তির মূল সুরটিও। গানে গানে তারই খোঁজ শুরু করেন তিনি এবার। একইসঙ্গে চলে দুটি জিনিস, পরিপূরক হিসেবে, রাজনীতি আর লেখনী।

এই সময় নিজেকে কৃষকসভার কর্মী হিসেবে পুরোপুরি নিয়োজিত করেন নিবারণ পণ্ডিত। ১৯৪১ সালে ঢাকায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ভয়ানক রূপ নেয়। ওদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও শুরু হয়েছে। ৪৩ এ আসে মহামারী, আর সঙ্গেই ছিল জাপানি আক্রমণের ভয়- সবে মিলে ভারতের উত্তাল রাজনৈতিক অবস্থার পরিস্থিতিতে বহু গানের জন্ম হয় নিবারণ পণ্ডিতের হাতে। ১৯৪২ সালের শেষদিকে চট্টগ্রাম ও আসাম মনিপুরে জাপানি বোমা পড়ে, কলকাতায় পড়ে ২০শে ডিসেম্বর। এই গানটি সেই সময়ে লেখেন নিবারণ, গানটির ভাষার সারল্যই এর বিশেষত্ব-

ওরে আসাম মনিপুরে
দিবারাত্র ঘর্ঘর শব্দ ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান উড়ে
চতুস্পার্শে আছে যারা, মৃতপ্রায় হইয়াছে তারা
সদায় এই চিন্তাধারা, কখন বোমা পড়ে-
দরদী কী নাইকো তাদের ডেকে জিজ্ঞাস করে
আপন বুচকা বান্ধে সবাই আপন আপন চিন্তা করে।

প্রসঙ্গত মনে পড়ার কথা, ৪৩ এর মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে লেখা এই গান- "গ্রামের মানুষ ধ্বংসের বন্যায় ভাসিয়া চলেছে হায়/ কে বাঁচাবে তোরা, কে বাঁচাবে, ওরে আয়, ওরে আয়।/ সান্ধ্য প্রদীপ জ্বলেনা রে আর/ সোনার পল্লী হল যে আঁধার/ নিশ্চিহ্ন হইল কত পরিবার/ গ্রামবাসী আজ অসহায়"; দুর্ভিক্ষের কারণে বাজারে নিদারুন লবণাভাব নিয়ে লেখা গানটি-" আমার মাঞ্জুর মায়ে তো কন্ট্রোল বুঝে না।/ রান্‌তে গেলে কান্‌তে বসে লবণ ছাড়া রান্‌ধে না"; কিংবা কালোবাজারির প্রতিবাদস্বরূপ লেখা- "ভাব কি চমৎকার গো দেশের ভাব কি চমৎকার/ চোরেরা খায় মণ্ডা মিঠাই সাধু করে হাহাকার"; বা ৪২-৪৩ সালের বস্ত্রাভাব নিয়ে লেখা এই গান- " বঙ্গনারী হইল বিবসনা/ দিবসেতে ঘর হইতে, বের হইতে আর পারে না/ কলসী কাঁখে অপরাহ্নে/ যায় না রে জলের জন্যে/ জলের ঘাটে গ্রাম্য ললনা/ আঁধার হলে যায় রে জলে, দিনের আলোয় আর আসেনা..." প্রভৃতি। গানগুলি পড়ে যে বিষয় স্পষ্টত দেখাই যায় তা হল, এই গানগুলির কাব্যগুণ বিশেষ নেই, কিন্তু কঠিন কথা সহজভাবে বলার মত দৃঢ়তা আছে, যেটা গ্রামের নিরক্ষর বা নিবারণ পন্ডিতেরই মত স্বল্প শিক্ষিত কিষাণ বা শ্রমিকদের বোঝবার উপযোগী।

এইসকল গান বাঁধতে বাঁধতে নিবারণ নিজস্ব একটি গানের স্কোয়াড গঠন করেন। কখনো প্রকাশ্যে, কখনো আত্মগোপন করে এই গানের স্কোয়াড গান গেয়ে গেয়ে গানগুলি ছড়িয়ে দেবার কাজ করত। ১৯৪৫ সালে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত কৃষকসভার নবম সম্মেলনে নিজের স্কোয়াড নিয়ে যোগ দেন তিনি। সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষে লেখা গানগুলির মধ্যে যে গানটি কৃষকদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, তা হল-

হারে ও কৃষক ভাই
মোদের কি আর বাঁচবার উপায় নাই।
হায় হায় রে
থালা বাসন হাঁড়িকুরি গৃহস্থের বেসার
ক্রমে ক্রমে বিক্রি করে চলিছে সংসার
অভাবগ্রস্ত পায় সমস্ত গৃহস্থ বেকার
অস্থি চর্মসার হইয়াছে থাকি অনাহার।

আরেকটি গান ছিল জারিগানের সুরে, ওই কৃষকসম্মেলনে বহুসংখ্যক কৃষক গায়কের দল নৃত্য সহযোগে যা পরিবেশন করেছিল, গানটি- " কপালের দুঃখ ঘুচবে কতদিনে রে/ হায় দুঃখ সয়না প্রাণেরে" এই জাতীয়।

১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে ময়মনসিংহর জেলা ম্যজিস্ট্রেট ব্যান্টিন সাহেবের সৈন্যের সঙ্গে গারো পাহাড়ের অধিবাসীদের গেরিলা লড়াই, বিশেষ করে মেয়েদের বীরত্বের কাহিনি নিয়ে নিবারণ পণ্ডিত যে পুথিপড়া গান রচনা করেন, তাঁর স্কোয়াডের সফিরদ্দিন জহর আলি, মহম্মদ আলি, রজব আলি প্রমুখ পাড়ায় পাড়ায় সেটি প্রচার করতে থাকেন। স্কোয়াডের শ্রেষ্ঠ গায়ক অখিল চক্রবর্তী বিভিন্ন গ্রাম্য আসরে গানটি গাইতে শুরু করেন। আর দেশভাগের পরে ঐ গানের জন্যই তিনি গ্রেপ্তার হন।

সমসময়ে গারো পাহাড় এলাকার উপজাতি হাজং কৃষকদের টংক প্রথার বিরোধিতা করেও গান রচনা করেন নিবারণ। টংক প্রথার অর্থ হল টাকা না দিয়ে ধানে খাজনা দেওয়া, ৯০ তোলার বদলে ১০০ তোলার হিসেবে খাজনা নেওয়া হবে – এই অত্যাচারের বিরোধিতায় শুরু হয়েছিল আন্দোলন। পুথিপড়ার সুরে একটি গল্প বলার ভঙ্গীতে নিবারণের এই টংকপ্রথা বিরোধী গানটি দারুন সমাদর পেয়েছিল, যার শুরুটা এরকম- " শুনেন যত দেশবাসী, শুনেন ভাই গরীব চাষী, শুনেন সর্বজন/ কৃষক দরদী মণি সিংহের বিবরণ/ সংক্ষেপেতে দুই এক কথা হে করিব বর্ণন..." তারপর গানে এক হাজং কৃষককে জানতে চায় ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে যাবার কারণ, কৃষকটি জানায় টংকপ্রথার কথা। মণি তারপর কথা দেয়, এ জুলুমবাজী সে আটকাবেই। তারপর মণির তৎপরতায় সভা হয় কৃষকদের, কর্মী আসে দশ হাজার, মেয়েরাও যোগ দেয় দলে দলে, টংকপ্রথার বিলোপ ঘটে একদিন।

এরপর ঘটে যায় দেশবিভাগ। দেশবিভাগের পর নিবারণ পণ্ডিত পূর্ব পাকিস্তানেই থেকে যান। ব্রিটিশরাজ চলে গেলেও কমিউনিস্টদের ওপর নির্যাতন চলতেই থাকে। লীগ সরকারের কৃষকস্বার্থবিরোধী দিকগুলি উল্লেখ করে পুস্তিকা রচনা করে, কৃষকদের মাঝে তা গাইতে গিয়ে সোজাসুজি প্রশাসনের নজরে পড়ে যান নিবারণ। ১৯৫০ এ আনসার বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে কারাগারে পাঠানো হয় তাকে, অকথ্য অত্যাচার করার পর ঐ বছরই ডিসেম্বরে মুক্তি দেওয়া হয় তাঁকে। কয়েকদিনের ভিতর সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায়, একবস্ত্রে তিনি ভারতে চলে আসেন।

এরপর তাঁর লেখালেখির এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। মূলত এইগুলি গান ও কবিতার ছোট সংকলন পুস্তিকার আকারে। পুস্তিকাগুলির পরিচয়-

১. বাস্তুহারার মরণকান্না : ভারতে এসে নিবারণ পণ্ডিত খেয়াল করেন লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের জন্য এখানে কোনো সুব্যবস্থা নেই। পথে, ঘাটে, রেল স্টেশনে কুকুর বিড়ালের মত জীবন

কাটাচ্ছে মানুষ। তিনি নিজেও প্রায় বিনা উপার্জনে নয়জনের সংসার নিয়ে অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছিলেন। সেই সময় এই পুস্তিকাটি লেখা। নিবারণ নিজে এই পুস্তিকা পঁয়ত্রিশ হাজার কপি বিক্রি করেন।

২. খাদ্যের বদলে গুলি : ১৯৫১ সালে কোচবিহার শহরে খাদ্যের দাবিতে মিছিলের ওপর গুলি চলে। পাঁচজনের মৃত্যু হয়। এই প্রেক্ষিতেই লেখা আলোচ্য পুস্তিকাটি, যা প্রায় একলাখ কপি নিবারণ হাটে বাজারে বিক্রি করেন।

৩. ভোট বৈতরণী কাব্য : ১৯৫২ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে লেখা।

৪. ভোট বৈতরণী চটকা : ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে লেখা।

৫. তোর্সানদী ভাঙার গান

৬. নীল বিদ্রোহের জারীগান

৭. সেই দিনগুলির কথা : ১৯৬২ সালে আসামে 'বঙাল খেদা'র প্রতিবাদে লিখিত।

১৯৬২ র পর শারীরিক অসুস্থতার কারণে স্কোয়াড নিয়ে ঘোরাঘুরির ক্ষমতা হারালেও লেখনী তাঁর সচলই ছিল ১৯৮০ অবধি প্রায়। বহু গান তিনি লিখেছেন এইসময়, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেগুলি বেশিরভাগই কালের গর্ভে তলিয়ে গেছে! ১৯৭৮ সালে গণনাট্য সংঘের তরফ থেকে সম্মানিত সদস্যপদ দেওয়া হয় তাঁকে। এর কিছু আগেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, কিছু পরে ধরা পড়ে ক্যান্সার। তারপর দীর্ঘদিনের চিকিৎসা শেষে ১৯৮৪ তে নিবারণ পণ্ডিতের জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

গণসংগীতকার হিসেবে নিবারণ পণ্ডিতের মূল্যায়ন করতে গিয়ে মনে হয়, আমাদের আলোচনার ভিতর ইনিই একমাত্র, যিনি নিজে শ্রেণিগতভাবে কৃষিজীবী। ফলে তত্ত্ব আর প্রয়োগের মধ্যে যে দূরত্ব, তার অভিজ্ঞতা নিবারণ পণ্ডিতের গানে নেই। লোকসুর ব্যবহার করেছেন তিনি প্রায় সবগানেই, কোনো গান বাঁধা বাউল সুরে, কোনোটা ভাটিয়ালী, কোনোটা বা জারী, কোনোটা ভাওয়াইয়া। রামপ্রসাদী সুরের ব্যবহারও করেছেন তিনি। কখনো চটকার সুর। আবার কোনো গানে লক্ষ করা যায় কথকতার ভঙ্গী। উপভাষার এসেছে তাঁর বহু গানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। যেমন এই গানটি – " আরে ও মোর বন্ধু দরদীয়া/

(বুঝি দেখ) কাঁয় বানাইল্ তোমাক্ নবীন বাইদিয়া"; কিংবা "হামরাগুলা হালুয়া কিষাণ কামাই করি খাং/ কাম নাই কাজ নাই কোটে এলায় যাং/ দিন হাজিরা আড়াই টাকা যদি বা কাম পাই/ দিনমনে সেই শুকান রুটি, দাদারে, ভাতের উদ্দিশ নাই"। যে গানগুলি উপভাষায় রচিত নয়, সেগুলির সহজ ভাষা-ব্যবহার নিয়ে তো আগেই কথা বলা হয়েছে। এই সমস্ত দিক মিলিয়ে দেখলে এই বিষয়টিই স্পষ্ট হয়, নিবারণ পণ্ডিতের গানের টার্গেট শ্রোতা ছিল গ্রামের কৃষক, মজুররাই মূলত; আর যেহেতু তিনিও তাদেরই একজন, তাই নিজেদের দুঃখ যন্ত্রণার কথা তাঁর কলম থেকে জীবনের প্রয়োজনেই বেরিয়েছে; গণসংগীত রচনার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। এটুকুই যথেষ্ট বলে মনে হয়। মধ্যবিত্তের দৃষ্টিতে 'জনপ্রিয়' তকমা পাওয়া দূর, নামের পরিচিতিটুকুও না ই বা মিলল!

- সলিল চৌধুরী (১৯২২-১৯৯৫)

গণসংগীত লিখতে আসা বিষয়ে সলিল চৌধুরী জানাচ্ছেন-

> গণসংগীত রচনা করার হাতেখড়ি আমার হয়েছিল গণনাট্য সংঘ গড়ে ওঠার বেশ কিছু আগে থেকেই। আমি থাকতুম আমার মামার বাড়ি সোনারপুর থাকার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে (এখন নাম সুভাষগ্রাম)। ওখান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে বঙ্গবাসী কলেজে পড়তে যেতুম সোনারপুর অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন তখন বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। বিদ্যাধরী নদী মজে যাওয়ায় বঙ্গোপসাগরের নোনা জল ঢুকে হাজার হাজার বিঘে ধান জমি নোনাজলে ভেসে গিয়ে অনাবাদী হয়ে গিয়েছিল। ফলে লক্ষ লক্ষ কৃষক ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়েছিল। সেটা ব্রিটিশ আমল। দাবি ছিল ড্রেজার দিয়ে খাল কাটতে হবে। মজা বিদ্যাধরীর বালু তুলে ফেলে দিয়ে ওটাকে জীবন্ত করে তুলতে হবে। তা ছাড়া কৃষককে ভরতুকি দিয়ে স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে চাল, আটা, ডাল, শিশুদের জন্য দুধ আর রোগীর জন্য ওষুধ বিতরণ করতে হবে। পিপল্স্ রিলিফ কমিটির একটা শাখা গড়ে উঠেছিল আমাদের গ্রামে, তারা দুধ-ওষুধ বিনামূল্যে চাষিদের মধ্যে বিতরণ করত। আমি কখন অজান্তে এই কৃষক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লুম। স্থানীয় দু-একজন কৃষক নেতা আমার কাছে একদিন এলেন এই আবদার নিয়ে যে, আসন্ন কৃষক সম্মেলনের জন্য দু-একটি গান রচনা করে আমায় গাইতে হবে। কলেজে আমি তখন বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির সংশ্রবে এসেছি, (১৯৪১-৪২ সালের কথা) ছাত্র ফেডারেশনও করি অল্পস্বল্প। আবার অন্যদিকে বাঁশি বাজিয়ে হিসেবেও খুব নাম আমার। গ্রামেই শুধু না, কলেজেও ইন্টার কলেজ কম্পিটিশনে পরপর তিনবার বাঁশিতে এস্রাজে প্রথম হয়েছি, তিমিরবরণের অর্কেস্ট্রাতেও ঢুকেছি। ...রোজ কলেজের পর রিহার্সাল করতে যাই- রাত করে বাড়ি ফিরি। ভুলেই গেলুম কৃষক সম্মেলনের কথা। তারপর

একদিন ওঁরা এসে হাজির-'চলো!' 'কোথায়?' জিজ্ঞাসা করলুম। 'সন্দেশখালি' ওঁরা বললেন। 'কালকেই সম্মেলন। গান রেড তো?' কী সর্বনাশ! বললুম- 'না না গান রেডি নেই, আর ওসব গান আমার দ্বারা হবে না- আমি যাব না।' ওঁরা নাছোড়বান্দা 'ঠিক আছে গান গাইতে হবে না, এমনি চলো।' শ্যামবাজার থেকে একটা লঞ্চে চেপে যাত্রা শুরু হল। যেতে যেতে ওঁরা বললেন- 'তোমার নাম প্রচার হয়ে গেছে-তুমি গাইবে না?'- আমার একটা সিঙ্গল রিডের হারমোনিয়াম ছিল- বাবা কিনে দিয়েছিলেন, সেটা ওঁরা তুলে নিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে। ভাবলুম চাষাভূষোর জন্য গান, কী আর এমন শক্ত ব্যাপার। একটা সাদামাটা সুর করে কথা বসিয়ে গেয়ে দিলেই হবে। কিন্তু সাদামাটা সুর করাটা কত শক্ত! শেষ পর্যন্ত ভাটিয়ালি সুর ভিত্তি করে একটা গান বেঁধে সম্মেলনে গাইলুম-(গানটা এখনও মনে আছে)

দেশ ভেসেছে বানের জলে, ধান গিয়েছে মরে
কেমনে বলিব বন্ধু, প্রাণের কথা তোরে

প্রচণ্ড হইচই সাড়া পড়ে গেল। দুবার তিনবার করে গাইতে হল। তখন আমার বড়োজোর আঠারো কি উনিশ বছর বয়স হবে। রক্তে আগুন লেগে গেল।[৮]

নির্দ্বিধায়, নিঃসন্দেহে এটিই সলিল চৌধুরীর লেখা প্রথম গণসংগীত। গানটি বেতার, রেকর্ড বা অনুরূপ কোনো মাধ্যমে উপলব্ধ নয়, তবে 'সলিল চৌধুরী রচনাসংগ্রহ'র ভিতর তা লিপিবদ্ধ। সম্পূর্ণ গানটি-

দেশ ভেসেছে বানের জলে, ধান গিয়েছে মরে।
কেমনে বলিব বন্ধু, প্রাণের কথা তোরে।
ঘরেতে চাউল নাই, পরনে পিরান নাই
অনাহারে দিবানিশি ভাসি নয়ন লোরে।

দেশ ভেসেছে বিশ বছরের ধোঁকাবাজির ঘোরে
(আর) কাজের নামে শোষণকারী লোটে কু'কাজ করে।
(তাই) নদীতে বাঁধন নাই, থেকেও না কাজ পাই
বিধির বিধান নয়কো এ ভাই বুঝবে কবে ওরে।

মানব না এ বিধান মানব না
অবহেলা অপমান সইব না
তোমাদের যতকিছু মারণ কাঠির ফল
ভুলব না, কিছুতেই ভুলব না।

বাঁচবোই বন্ধু একহাতে বাঁচবো
দেশজোড়া ভাই বোন কন্যা

শোষকের সৃষ্টি এ বন্যা।

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতিয়ার শানিয়ে
আনব নতুন দিন, বাজবে প্রাণের বীণ
মিলিত মিছিলে হবে ধন্যা।

এই গানটি পুরোটা উল্লেখ করা হল, নান্দনিকতার বিচারে এ গানের দুর্বলতা বোঝানোর জন্য। উনিশ বছর বয়সের এই লেখা ক্রমে উন্নত হতে হতে হয়ে উঠবে গীতিসাহিত্য- সেই বিষয়ে পৌঁছতে চেয়ে শুরুর উদাহরণটি রাখা হল মাত্র! খেয়াল করার বিষয় আবার ভাটিয়ালির সুর; সলিল চৌধুরী পরবর্তীকালের গণচেতনার গানে লোকসুর, দেশজ সুর ব্যবহারে যেখানে অনীহাই দেখিয়েছেন!

এ তো গেল শুরুর কথা। ১৯৫১ তে যখন সলিল পাড়ি দিলেন বম্বের উদ্দেশে, গণনাট্যের সঙ্গে সম্পর্কে তিক্ততা বাড়ল, সেই চলে যাবার কারণ বহুজন বহু সাক্ষাৎকারে জানতে চেয়েছেন তাঁর কাছে। তার ভিতর একটি সাক্ষাৎকার থেকে এই অংশ তুলে দেওয়া গেল-

-...পার্টির সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদের কারণটা কী?

- আমার সম্পর্কে বলা হয়েছে আমি পলাতক। কিন্তু কোন্ অবস্থায় আমি পালাতে বাধ্য হয়েছি তা শুনলে যে কেউই পালাবে। বাবা মারা গেছেন, বিধবা মা, ছটি ছোটো ছোটো ভাইবোন নিয়ে দিনের পর দিন literally starve করেছি। পার্টি থেকে একদিনের জন্য কেউ খোঁজ নিতে যায়নি আমি কী করে বেঁচে আছি। তখন 'পাশের বাড়ি', 'পরিবর্তন', 'বরযাত্রী' এসব ছবিতে সুর দেওয়া হয়ে গেছে; গাঁয়ের বধূ, রানার, পালকি চলে এসব রেকর্ড হয়ে গেছে। সেই সময় বিমল রায় জানালেন যে আমার 'রিকশাওয়ালা' গল্পটা নিয়ে উনি হিন্দি ছবি করতে চান- দো বিঘা জমিন। তখন এ তো আমার কাছে হাতে চাঁদ পাওয়া। নিছক বেঁচে থাকার জন্যই আমাকে বম্বে চলে যেতে হল।[৯]

অর্থাৎ ১৯৪১ থেকে '৫১ এই দশ বছরেই মোটামুটি যা সলিলের গণচেতনার গান, সেগুলি লেখা। হতে পারে সেগুলি পরে রেকর্ড আকারে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ওই দশ বছরই সলিল মনে মনে কেবল গণনাট্যেরই ছিলেন।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করার। সেটা হল 'ক্লাস', পরিবার সূত্রে পাওয়া কালচার। সলিল চৌধুরীর বাবা জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী ছিলেন আসামের শিবসাগর জেলার লতাবাড়ি চা বাগানে

কুলি, মজুরদের ডাক্তার। চা বাগানের ম্যানেজার অপমানজনক কথা '(কাম হিয়ার ডার্টি নিগার') বলায় এক ঘুষিতে তার তিনটে দাঁত ভেঙে দিয়ে কোম্পানির হাতির মাহুতের পরামর্শ মেনে ডাক্তারি ছেড়ে, সপরিবারে এসে উঠেছিলেন তিনি পৈতৃক দেশ দক্ষিণ বারাসাতে। সেখানে খুলে বসেছিলেন ডিসপেনসারি। বারাসাতে থাকাকালীন বিদেশী বয়কটের উত্তেজনায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ দু'-তিন ট্রাঙ্ক ভরতি দামি দামি সুট পুড়িয়ে ফেলেন, কানাঘুষোয় রটে যায় তাঁকে নাকি জেলে দেওয়া হবে। এদিকে সমস্ত গ্রামের লোককে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে যখন সর্বস্বান্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ, ঠিক করলেন পাওনা আদায়ে বেরতে হবে এবার, তখন তাঁকে ঘিরে রটল জঘন্য কুৎসা। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের সাথে সলিল ফিরে গেলেন আসামে, তবে এবার একরাজান চা বাগানে। যদিও কয়েক বছরের মধ্যেই পদোন্নতি পেয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চলে যান কাজিরাঙায়, সেখানেই থিতু হন শেষমেশ। জ্ঞানেন্দ্রনাথ চা-শ্রমিকদের দারুন ভালোবাসতেন, হাসি-ঠাট্টায় জমিয়ে রাখতেন তাদের সর্বদা। তাদের নিয়ে নাটকও করেছিলেন। কাজেই চা-শ্রমিকদের প্রতি মমত্ববোধ সলিলের জেগে ওঠে ছেলেবেলাতেই, বাবাকে দেখে। আর গানের প্রতি ভালোবাসাও তাঁর বাবার সূত্রে পাওয়া। আত্মজীবনী 'জীবন উজ্জীবন' এ জানিয়েছেন তিনি, লতাবাড়ি চা বাগান থেকে তড়িঘড়ি করে বারাসাত চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তে বহু জিনিস জলের দরে বেচে দিলেও একটা চোঙা দেওয়া কুকুর মার্কা কলের গান আর শ'খানেক ইংরেজি বাজনার রেকর্ড কাছছাড়া আদৌ করেননি তাঁর বাবা। রেকর্ডগুলি Bach, Beethoven, Mozart, Schubert প্রমুখের। রাত নটা বাজলেই কলের গানে এই রেকর্ডগুলি চালিয়ে দিতেন তিনি, তাই ন'টা বাজার অপেক্ষা করতেন রোজ সলিল ও তাঁর ভাইবোনেরা। কুলি-মজুরদের নাটকের জন্য গানে সুরও দিয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। এভাবেই, গান, বিশেষ করে পাশ্চাত্য সঙ্গীত, তার সুর, ছন্দ, চলন রক্তের সঙ্গে মিশতে শুরু করে সলিলের। আর যা মনের গভীরে ঠাঁই করে নিয়েছিল তা হল, আসামের কাজিরাঙা অরণ্যের গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গের অসামান্য সিম্ফনি।

আসামের চা বাগান থেকে সলিল দাদা সুনীলকে নিয়ে ১৯৩৩ সালে কলকাতায় আসেন। এসে ওঠেন ২১ নং সুকিয়া স্ট্রীটে জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে। থাকেন একবছর। সেখানে তাঁর জ্যাঠতুতো দাদা নিখিল চৌধুরী ছিলেন সংগীত পরিচালক। আর ওই বাড়িতেই আসর বসত এক অর্কেস্ট্রা দলের, নাম 'মিলন পরিষদ'। এর প্রতি স্বভাবতই আকৃষ্ট হন সলিল এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে হাতেখড়িও হয় এখানেই। পিয়ানো, তবলা, বাঁশি, বেহালা, এস্রাজ,

সেতার, এমনকি গিটার শেখা শুরু হয়। যদিও সেই শিক্ষা বেশিদিন জিইয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। এখানে আসার একবছরের মাথায় দুই ভাই উঠে যান দক্ষিণ কলকাতার কোদালিয়া গ্রামে, মামাবাড়িতে। সেই মামাবাড়ি থেকে হরিণাভি অ্যাংলো-সংস্কৃত স্কুলে যাবার পথে পড়ত একটা মেথর পল্লী। দিনের পর দিন ধরে জমা হওয়া অসম্মান, অনাচার ও সামাজিক নিগ্রহের বিরোধিতা করে সেখানকার মেথররা একদিন স্ট্রাইক করে। সেইদিন মেথরদের ওপর হওয়া নির্যাতন প্রভৃতিকে নতুন চোখে যেন দেখেন সলিল, ততদিনে কমিউনিজমের সঙ্গেও পরিচয় ঘটছিল, সবকিছু একত্রিত হয়ে রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ জন্মায় তাঁর এবং রাজিনীতিতে আসেন প্রত্যক্ষভাবে। এরপর গণসংগীত রচনা কীভাবে, কোন্ সূত্রে ঘটল, সে কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

অর্থাৎ এক স্বচ্ছল, সংস্কৃতিমনস্ক পারিবার থেকে উঠে আসা সলিলের। সংগীত বিষয়ক সলিল চৌধুরীর প্রবন্ধগুলি পড়লে, বা সাক্ষাৎকারগুলি খেয়াল করলে বারবারই মনে হয় গণসংগীতই হোক বা আধুনিক বাংলা গান- সলিল চৌধুরী বরাবরই চেয়েছেন নান্দনিকতার বিচারে তাঁর গানগুলি নিয়ে কোন প্রশ্ন না উঠুক। তাঁর গানের সুর যেন গানের কথার সঠিক পরিবাহী হয়ে উঠতে পারে আর সেই কারণেই অর্কেস্ট্রেশন, কোরাস, কর্ডের নতুনত্ব, হারমোনি ইত্যাদি নিয়ে অনবরত ভাবনাচিন্তা করে গেছেন তিনি। এ কথা অস্বীকার করার কোন জায়গাই নেই, গানের 'কথা' ও 'সুর' দুই বিষয়েই এমন যত্নশীল রবীন্দ্রনাথের পর কাউকে পাওয়া যায়নি আর। রবীন্দ্রনাথের পর সলিলই প্রথম বলিষ্ঠ সংগীতস্রষ্টা। কমিউনিস্ট রাজনীতি বা গণনাট্যের প্রতি তাঁর আবেগ প্রবল ছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁর চূড়ান্ত এবং প্রধানতম কাজ হিসেবে তিনি মানতেন সংগীতের জন্য সংগীত সৃষ্টিকেই, গণনাট্য প্রেরণার কাজ করেছে শুধু, এটা আমাদের অভিমত। যদিও মুখে বলেছেন তিনি, গণসংগীতের সুর তেমনই হওয়া উচিত, যার মাধ্যমে কথার আকুতি শ্রোতার কান অবধি পৌঁছতে পারে; কিন্তু খেয়াল করা দরকার, মধ্যবিত্ত ইনটেলেকচুয়াল শ্রোতাই তাঁর গণসংগীতেরও বোদ্ধা, কারণ পাশ্চাত্য সংগীত সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে কে ই বা বুঝবে কর্ডের পর কর্ডের পরিবর্তন, হারমোনি প্রভৃতি! স্পষ্টত বলেছেন সলিল, এমন গান হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কাছে পাওয়া যাবে না, যে গানের সুর তাঁর নিজের; গণসংগীত নতুন ফর্ম, নতুন সুর দাবি করে- আর সেই কাজই সলিলের অভীষ্ট। বিভিন্ন আলাপ আলোচনায় তিনি এ কথা বলেছেন- গণ-আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে না থেকে গণসংগীত নিয়ে আলোচনা তাত্ত্বিক কচকচি হয়ে দাঁড়ায় মাত্র, কিংবা 'গাঁয়ের বধূ'র মত গান বৈঠকখানায় বসে লেখা যায়না-

প্রভৃতি সংগ্রামপন্থী মানুষের মত কথা; তবু এটা বাস্তব যে, নিবারণ পণ্ডিত, বা গুরুদাস পাল বা রমেশ শীল-এঁদের মত খালি পেটে খাবারের জন্য লড়াই আর গান লেখার অভিজ্ঞতা সলিলের জীবনে একত্রে ঘটেনি। যেদিন সত্যিই অন্নাভাব দেখা দিয়েছে, সেদিন পেটের ভাতের আশ্বাস পেয়েছেন যেখানে, সেই বম্বের দিকে যাত্রা করেছেন। যদিও, কিষাণ, মজদুরের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই তাঁর গণসংগীত লিখতে আসা, কিন্তু শেষ অবধি দেখা গেছে, যে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধা, সংস্কৃতি বুকে করে তিনি গণনাট্যের মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর গান ওই মধ্যবিত্ত ক্লাসটার মধ্যেই আটকে থেকেছে, প্রশংসিত হয়েছে বেশি। চল্লিশের দশক জুড়ে নানা জমায়েতে কৃষক-শ্রমিকের মন তা ছুঁলেও, সে গান তাদের ভিতর বেঁচে থাকেনি, যেমন বাঁচিয়ে রেখেছে মিডল ক্লাস। চিরকালীন 'জনপ্রিয়তা' পাওয়া শিল্পীদের জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান ও জনপ্রিয়তার পুনর্মূল্যায়নের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই বর্তমান অধ্যায়ের অবতারণা বলে এই কথাগুলি বলা।

ধরেই নেওয়া গেল, সলিল চৌধুরীর গণসংগীত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেই বেশি জনপ্রিয়; কিন্তু সেই জনপ্রিয়তার কারণ জানা জরুরী। এবার সেই বিষয়ে কথা বলা যাক। গণসংগীতকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার অন্যতম শর্ত গানের বিয়বৈচিত্র। ধরা যাক 'ও আলোর পথযাত্রী' গানটি। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের যুবসমাজ কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে। দেশভাগের মধ্য দিয়ে আসা স্বাধীনতা, শাসক কংগ্রেসের অরাজকতা- এসব দেখে হতাশ সলিল নতুন করে দেশের কাজ করবার প্রেরণা জোগাতে লেখেন এই গান, তা যতখানি গান, সাহিত্যও ততখানিই-

ও আলোর পথযাত্রী, এ যে রাত্রি এখানে থেমো না,
এ বালুর চরে আশার তরণী তোমার যেন বেঁধো না।
আমি শ্রান্ত যে, তবু হাল ধরো, আমি রিক্ত যে, সেই সান্ত্বনা
তব ছিন্ন পালের জয়পতাকা তুলে সূর্যোতোরণ দাও হানা।

আহা বুক ভেঙে ভেঙে পথে ঢেলে শোণিত কণা,
কত যুগ ধরে ধরে করেছে তারা সূর্য রচনা।
আর কতদূর, ঐ মোহানা, এ যে কুয়াশা, এ যে ছলনা!
এই বঞ্চনার দিন পার হলেই পাবে জনসমুদ্রের ঠিকানা।

"দেশ ভেসেছে বানের জলে, ধান গিয়েছে মরে" গানটির সঙ্গে এ গানটির নন্দনতত্ত্বগত তফাত খেয়াল করা যায় যথেষ্ট। সাহিত্যগুণের জন্যই ইনটেলেকচুয়াল মানুষের তা মনে

ধরে যায়। এ গানের প্রথম দুটি স্তবকের সুর চলে ঢিমে লয়ে, তারপর কথার সঙ্গে মিলে সুরও হয়ে ওঠে চঞ্চল, যা সলিলের নিজস্বতার প্রতীক। সেই অংশটি-

আহ্বান, শোনো আহ্বান আসে মাঠ ঘাট বন পেরিয়ে,
দুস্তর বাধা প্রস্তর ঠেলে বন্যার মতো বেরিয়ে।
যুগসঞ্চিত সুপ্তি দিয়েছে সাড়া,
হিমগিরি শুনল কি সূর্যের ইশারা!
যাত্রা শুরু উচ্ছল রোলে, দুর্বার বেগে তটিনী,
উত্তাল তালে উদ্দাম নাচে মুক্ত শত নটিনী।
এ শুধু সুপ্ত যে নবপ্রাণে জেগেছে, রণসাজে সেজেছে
অধিকার অর্জনে, আহ্বান, শোনো আহ্বান।

এই জাগরণের গান আরো কিছু লিখেছেন সলিল। আরেকটি যেমন "আলোর দেশ থেকে আঁধার পার হতে কে যেন ডাকে আমায়,/ সে গানে প্রাণের কুসুমকলি তাই ফুটেছে নব মায়ায়।/ এখানেই আছে, কোথায় সে সোনার দেশ?/ আভাসে সবার মাঝে পাই যেন তারই রেশ!/ সূর্যের শরাঘাতে এ কুয়াশা ছিঁড়ে দাও।/ পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে হাতে করে তুলে নাও।/ সে পথ এখানে, সে পথ এখানে, সে পথ এখানে আছে/ সে সোনার দেশ/ আভাসে সবার মাঝে পাই যেন তারই রেশ।" এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে জনপ্রিয় গান বোধ হয় এইটি-

পথে এবার নামো সাথী
পথেই হবে পথ চেনা।
জনস্রোতে নানান মতে
মনোরথের ঠিকানা,
হবে চেনা হবে জানা।
অনেক তো দিন গেল বৃথা এ সংশয়ে,
এসো এবার দ্বিধার বাধা পার হয়ে,
তোমার আমার সবার স্বপন
মেলাই প্রাণের মোহানায়।
কিসের মানা?
হবে চেনা হবে জানা।

এই গানটি তাঁর বোম্বে যাওয়ার পরে রেকর্ড করা। ১৯৫৪ সালে। রেকর্ড করেছিলেন স্বয়ং হেমন্ত মুখোপধ্যায়। তাও আবার পুজোর রেকর্ড। অর্কেস্ট্রার প্রয়োগে জাঁকজমক সহযোগে বিখ্যাত গায়কগায়িকাদের দিয়ে গণসংগীতগুলি রেকর্ড করাবার পিছনে সলিল

যুক্তি দিয়েছিলেন, পপুলার কালচার, যা অন্তঃসারশূন্য কার্যত, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকতে পারবে একমাত্র গণসংগীতই, আর লোকসংগীতের ফর্মে গণসংগীতকে তিনি মানতে চাননি ব'লে বলেন, একটা দোতারা নিয়ে গণসংগীত গাইলে কেউ শুনবে না, যথার্থ টেকনিক আয়ত্ত করে গান উপস্থাপন করতে হবে। এই যে বক্তব্য সলিলের, এ বক্তব্য মধ্যবিত্ত বাঙালির উদ্দেশেই নিশ্চয়ই, যারা পুজোর গানের ক্যাসেট কেনাকে কালচারের মধ্যেই ফেলেন।

বিষয় বৈচিত্রের কথা হচ্ছিল সলিলের গণসংগীতে। কৃষক আন্দোলনের গান খুঁজলে বহুর দেখা মিলবে। তেভাগা আন্দোলকে নিয়ে লেখা বিখ্যাত 'হেই সামালো ধান হো/ কাস্তেটা দাও শান হো' স্মরণযোগ্য প্রথমেই এক্ষেত্রে। তেলেঙ্গানা প্রসঙ্গে লেখা এই গানটিও উল্লেখ্য- "ও ভাই চাষি খেতের মজুর যতেক / কিষাণ কিষাণী (সজনী)/ এই বেলা নাও তেলেঙ্গানার পথের নিশানি"। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের রেকর্ড করা এই গানটির কথাও বলতে হয়- " আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে/ আয় রিমঝিম বরষার গগনে রে/ কাঠফাটা রোদের আগুনে/ আয় বৃষ্টি ঝেঁপে আয়রে/ হায় বিধি বড়োই দারুণ/ পোড়ামাটি কেঁদে মরে ফসল ফলেনা/ হায় বিধি বড়োই দারুণ/ ক্ষুধার আগুন জ্বলে আহার মেলেনা!"

দেশমুক্তির গানও রয়েছে সলিলের বেশ কিছু। যেমন- "নন্দিত নন্দিত দেশ আমার, দেশ আমার।/ নিশি দিশি বন্দিত দেশ আমার, দেশ আমার।/ হায়রে দেশবাসীরে/ তবু কেন বঞ্চিত দেশ আমার!/ আমরা যে মুক্তির নবজীবনের দূত/ মরা গাঙে আনি জোয়ার"; এছাড়া "মানব না এ বন্ধনে / মানব না এ শৃঙ্খলে।/ মুক্ত মানুষের স্বাধীনতা অধিকার/ খর্ব করে যারা ঘৃণ্য কৌশলে।/ দুই শতাব্দীর নাগপাশ বন্ধন/ নিঃস্ব হল কত অগণিত প্রাণমন।/ দুঃশাসন ভেঙে মুক্তির তরে হায়/ লাখো শহিদের অমূল্য প্রাণ যায়।/ মূল্যে তারা যারা মসনদে গদিয়ান/ জনতার দাবী দুই পায়ে দলে!", কিংবা "এই দেশ এই দেশ/ আমার এই দেশ/ এই মাটিতে জন্মেছি মা/ জীবন মরণ তোমার শরণ/ তোমার চরণ-ধূলি দাও মা" প্রভৃতি।

আশ্চর্য সেই গানটি সলিলের, যা বিশেষ কোন ঘটনার প্রতিবাদ করে নয়, তবু 'প্রতিবাদ'কেই থিম করে লেখা-

আমার প্রতিবাদের ভাষা,
আমার প্রতিরোধের আগুন,

দ্বিগুণ জ্বলে যেন দ্বিগুণ দারুণ প্রতিশোধে।
করে চূর্ণ, ছিন্নভিন্ন শত ষড়যন্ত্রের জাল যেন।
আনে মুক্তির আলো আনে, আনে লক্ষ শত প্রাণে,
শত লক্ষ কোটি প্রাণে।
আমার প্রতি নিঃশ্বাসের বিষে, বিশ্বের বঞ্চনার ভাষা।
দারুণ বিস্ফোরণ যেন ধ্বংসের গর্জনে হানে।
যত বিপ্লব বিদ্রোহের আমি সাথী।
আমি মাতি যুদ্ধের হেথায় সেথায়,
মানুষের মুক্তির বিপন্নতায়।
আমারই রক্ত ঝরে দেশে দেশে বন্দরে,
শত মরু কন্দরে গৌরী শিখায়।
মিলনের তীর্থের সন্ধানে।
আনে মুক্তির আলো আনে।

কিছু আছে সলিল চৌধুরীর শান্তির গান। অন্যতম সেইগুলির ভিতর- "আমাদের নানান মতে নানান দলে দলাদলি"। গানটির দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবক এক্ষেত্রেও দ্রুততালে চলে, কারণ উত্তেজনা এই অংশগুলিতেই বেশি-

যখন প্রশ্ন ওঠে ধ্বংস কি সৃষ্টি,
আমাদের চোখে জ্বলে আগুনের দৃষ্টি।
আমরা জবাব দিই, সৃষ্টি সৃষ্টি সৃষ্টি।
যখন প্রশ্ন ওঠে, যুদ্ধ কি শান্তি,
আমাদের বেছে নিতে হয়নাকো ভ্রান্তি।
আমরা জবাব দিই, শান্তি শান্তি শান্তি...

শহীদ স্মরণে লেখা একটি গান উল্লেখ করা যায় আলোচনায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় পুলিশের হাতে কৃষক ও কৃষক রমণীরা শহীদ হলে এই গানটি লেখেন সলিল, ১৯৪৭ এ কবি সুকান্তের মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণেও যে গান গাওয়া হয়েছিল-

তোমার বুকের খুনের চিহ্ন খুঁজি
ঘোর আঁধারের রাতে।
ও দেশের বন্ধু শহীদ
ঝড় বাদলের রাতে।
যেন পথ না হারায় পাঁকে,
মোদের নিশানা ঠিক থাকে।
জ্বেলো দেশপ্রেমের মশাল চোখে,

অস্থির বাজ হাতে দিও,
অস্থির বাজ হাতে।
যেমন থাকে আঁধার কেশে
সিঁথির সিঁদুর রেখা,
আঁধার মেঘে জ্বলে যেমন
বিজুলির লেখা।
যেন তেমনি চোখে থাকে,
দেশের জটিল কুটিল বাঁকে,
তোমার খুনে রাঙা পথের সে দাগ।
তোমার খুনে রাঙা পথের দাগে,
যাই যেন একসাথে সবাই,
যাই যেন একসাথে।

স্বাধীনতা অর্জনের পর কংগ্রেসি শাসনকালে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, সেই আন্দোলনের জন্য লেখা সলিলের এই গানটিও বিশেষভাবে খেয়াল করার। পৌরাণিক ঘটনার উপস্থাপন এ গানের একটা চমক, যা সচরাচর গণসংগীতে থাকে না-

ভাঙো ভাঙো ভাঙো ভাঙো ভাঙো কারা
ভাঙো ঐক্যের আঘাতে ভাঙো, ভাঙো, ভাঙো
ভাঙো ভীম পদাঘাতে ভাঙো, ভাঙো, ভাঙো
ভাঙো ভাঙ্‌রে কারাগার।

এই কংসের মরণ ফাঁদে (কারা ভাঙো ভাঙো)
হেথা মুক্তির দেবতা কাঁদে (কারা ভাঙো ভাঙো)
হায় মিথ্যের কুয়াশায় বন্দি
কারা সত্যের সূর্যকে বাঁধে রে
তাই কারখানা কলে মাঠে ঘাটে,
ঐক্যের বন্যাকে আনো আনো
আজ দ্বার খোলো কোটি কোটি হাতে,
মুক্তির বজ্রকে হানো হানো হানো রে।

শ্রমিকদের ধর্মঘট সমর্থন করে কিছু গান লিখেছিলেন সলিল। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় যে গান, তা ঐতিহাসিক নৌ বিদ্রোহের সমর্থনে ২৯ শে জুলাই, ১৯৪৬ সালে সারা ভারতব্যাপী যে ধর্মঘট হয়, সেই ধর্মঘট উপলক্ষে লেখা-

শোষণের চাকা আর ঘুরবে না, ঘুরবে না
চিমনিতে কালো ধোঁয়া উঠবে না, উঠবে না
বয়লারে চিতা আর জ্বলবে না, জ্বলবে না,
চাকা ঘুরবে না, চিতা জ্বলবে না
ধোঁয়া উঠবে না, চাকা ঘুরবে না
লাখে লাখে করতালে হরতালে হেঁকেছে, হরতাল হরতাল হরতাল!
আজ হরতাল, আজ চাকা বন্ধ!
ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে, আলো ফুটছে, প্রাণ জাগছে...

সারা ভারত রেলওয়ে গ্যাংম্যানদের ধর্মঘট উপলক্ষে লেখা একটি গান হারিয়ে যাওয়ার মুখে সংগ্রহ করেছিলেন সলিল গবেষক সমীরকুমার গুপ্ত। গানটি এরকম-

এই সংগ্রাম দিয়েছে পুকার
জাগো রেল মজদুর, জাগো জাগো।

রেলমজুরের বাহুর জোরে সারা ভারতে
ছুটছে গাড়ি সরকারের
ছুটছে রসদ ভারতের
রেল মজুরের পেটে ভাত নাই রে!
রেলমজুর ও রেলমজুর...

গণসংগীতকার হিসেবে খুব স্বাভাবিকভাবেই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গাকেও বিষয় করেছিলেন সলিল চৌধুরী। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দীর কুমন্ত্রণায় কলকাতায় শুরু হয় বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। রাজ্যের সর্বত্র এই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে সেই দাঙ্গা থেকে সরে আসবার জন্য সুবুদ্ধি দিয়ে সলিল লেখেন একটি গান। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই গানটির মধ্যে ছেলেবেলার আসামকে রেখেছেন তিনি যত্ন করে, কারণ গানটি বিহু সুরে বাঁধা। কথার সঙ্গে মিলিয়ে সুরের চলনটিও গানের চমকপ্রদ। প্রথমদিকে সেতু নির্মাণের মশলা জড়ো হচ্ছে, তারপর যেন কাজ শুরু হল, গানের কথায়, সুরেও-

ও মোদের দেশবাসীরে
আয়রে পরাণ ভাই আয়রে রহিম ভাই
কালো নদী কে হবি পার।

এই দেশের মাঝে রে পিশাচ আনে রে
কালো বিভেদের বান,
সেই বানে ভাসে রে মোদের দেশের মান।
এই ফারাক নদীরে বাঁধবি যদি রে
ধর গাঁইতি আর হাতিয়ার
হেঁইয়া হেই হেঁইয়া মার, জোয়ান বাঁধ সেতু এবার।

এই নদী তোমার আমার খুনেরি দরিয়া
এই নদী আছে মোদের আঁখিজলে ভরিয়া
এই নদী বহে মোদের বুকের পাঁজর খুঁড়িয়া
মোরা বাহু বাড়াই দুই পারেতে দু'জনাতে থাকিয়া।
ওরে নদীর পাকে পাকে কুমীর লুকায়ে থাকে
ভাঙে সুখের ঘর ভাঙে খামার
হেঁইয়া হেই হেঁইয়া মার, জোয়ান বাঁধ সেতু এবার।

হেঁইয়া হেই, মারো জোর,
বাঁধি সেতু বাঁধিরে, বাঁধি সেতু বাঁধিরে।
বুকেতে বুকেতে সেতু অন্তরের মায়া ঘিরে বাঁধিরে
কুটিলের মায়া যত ঘৃণার নিষ্ঠুরাঘাতে ভাঙিরে
সাম্যের স্বদেশভূমি গড়ার শপথ নিয়ে বাঁধি রে।
হেঁইয়া হেই মারো জোর, বাঁধি সেতু বাঁধি রে
বাঁধি সেতু বাঁধি রে।

'বিষয়' ছেড়ে এইবার আসা যাক গানের কাঠামোগত বিশ্লেষণে। এমন কিছু গণসংগীত সলিলের বিখ্যাত হয়েছে যেগুলি একটানা গল্পের মত, গল্পই আসলে, গল্প শেষ হলে গানটি আর পাঁচটি সাধারণ গানের মত স্থায়ী অংশে ফেরেনা। সম্ভবত এমন গান লেখার অনুপ্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার' কবিতাটি থেকে, যে কবিতায় অসামান্য সুরারোপ তিনি করেছিলেন। এরকম দুটি ব্যালাডধর্মী গান সলিলের 'গাঁয়ের বধূ' আর 'সেই মেয়ে'। প্রথম গানটিতে এক মায়াঘেরা গ্রামের কথা। সোনার ধানের ফলন খুব ভালো হওয়ায় সে গাঁয়ের এক কৃষাণ বধূর সুখের অন্ত নেই, স্বামীর সঙ্গে দিনগুলি তার খুশি আর সোহাগেই কাটছিল। সেই আনন্দের চিত্রপটটি মুহূর্তে পালটে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে, জোতদার জমিদারের লালসায় ও শোষণে। সেই বিষয়টি দুর্বিপাককে এইভাবে উপস্থাপন করেন সলিল-

ডাকিনী যোগিনী এল শত নাগিনী
এল পিশাচেরা এল রে
শতপাকে বাঁধিয়া নাচে তাতা তাধিয়া
নাচে তাতা তাধিয়া নাচে রে।...

সুচিত্রা মিত্র রবীন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণকলি' গেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাই সুচিত্রার জন্যই ময়নাপাড়ার মাঠের কৃষ্ণকলির অনুষঙ্গ টেনে লিখেছিলেন সলিল 'সেই মেয়ে'। কালো-হরিণ-চোখের মেয়েটির আজ আর লাবণ্য নেই। ক্ষুধার জ্বালায় সে ক্লিষ্ট। শীর্ণ হয়েছে তার শরীর। আজ দ্বারে দ্বারে সে অন্ন ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে- এই হল এ গানের গল্প। তবে গানটি শেষ হয় আশাবাদ দিয়ে-

আবার কোনোদিন যদি তুমি
তারে দেখো পথে
বোলো তারে, বোলো তারি তরে
ময়নাপাড়ার থেকে খবর আছে
তারি কাছে রে-
সে যেন ফিরে যায় রে।
সেখানে গাছে গাছে
রাঙা ফুল ফুটিয়াছে,
রাঙা মেঘ রাঙায় কন্যার আশা।
পৌষালির মাঠে মাঠে
সোনালি ফসল কাটে
গড়বেই নতুন জীবনের বাসা।...

এই গান বুঝতে পারার জন্য তো রবীন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণকলি' শোনা দরকার। ক'জন কৃষক, ক'জন মজুর তা শুনেছেন? বোঝাই যায় কার্যত, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জন্যই এ গান লেখা। সলিল চৌধুরী র গান ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার নিয়মিত গাইত। অনেক পরে (২০০৭) তাঁরা আশা অডিও থেকে 'আমাদের সলিলদা' নামে সলিল চৌধুরীর গণসংগীতের একটি সংকলন বার করেন। ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যারের কর্মকাণ্ড মূলত নগরকেন্দ্রিক, বরাবর। তাঁদেরই টার্গেট শ্রোতা চিরকালই নাগরিক, শিক্ষিত মানুষ; আর এদের কাছেই সলিল চৌধুরীর গান বেশি করে ছড়িয়ে দেবার কাজ করেছে এই কয়্যার। সলিল চৌধুরী নিজে 'ও আলোর পথযাত্রী', 'হেই সামালো', 'আর দূর নেই, দিগন্তের বেশি দূর নেই', 'আয়রে ও আয়রে', 'তোমার বুকের খুনের চিহ্ন খুঁজি প্রভৃতি গান শিল্পী বদলে,

অ্যারেঞ্জমেন্ট বদলে বারবার রেকর্ড করে গেছেন; বলাই বাহুল্য একজন সংগীত পরিচালক, সংগীতকার হিসেবে নিজের আত্মতৃপ্তির জন্যই তা করেছেন, আর এ ও বলা বাহুল্য, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সংগীতরসিকই তা শুনেছেন। এইসকল ঘটনা যা প্রমাণ করে, ইতিমধ্যে সেই কথা আলোচনায় বলা হয়েছে, শেষে সেই বক্তব্যেই ফিরতে চাওয়া হল।

- ভূপেন হাজারিকা (১৯২৬-২০১১)

ভূপেন হাজারিকার জনপ্রিয়তা মূলত গায়ক হিসেবে। জনপ্রিয়তার মূল কারণ একইসঙ্গে তাঁর ব্যারিটোন কণ্ঠস্বর ও কণ্ঠের কোমল ভঙ্গী। আসামে জন্ম হলেও ভূপেন বাংলায় আসামের চেয়ে কম বিখ্যাত নন। আসামের সদিয়ায় জন্ম তাঁর। তাঁর বাবা ছিলেন নীলকান্ত হাজারিকা, মা শান্তিপ্রিয়া হাজারিকা। মা-বাবার দশ ছেলেমেয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়।

১৯৪২ সালে গুয়াহাটির কটন কলেজ থেকে তিনি ইন্টারমিডিয়েটে আর্টস, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৪ সালে বি. এ. এবং ১৯৪৬ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম. এ. পাশ করেন। ১৯৫২ সালে নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন ভূপেন।

ছোটবেলা থেকেই ছিল গানের প্রতি ঝোঁক। শৈশব- কৈশোরের সময়টা জুড়ে আসামের বিভিন্ন প্রদেশের গান মনের মধ্যে স্থায়ী জায়গা করে নিচ্ছিল তাঁর। যেমন অসমিয়া গীতিকার আনন্দীরাম দাস, পার্বতীপ্রসাদ বড়ুয়া, কমলানন্দ ভট্টাচার্যের মাধ্যমে স্থানীয় বরগীত, গোয়ালপাড়ার গান, চা মজদুরের গান, বিহু- প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ হয়। পরবর্তীকালে বিখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জ্যোতিপ্রকাশের প্রভাবও পড়ে তাঁর উপর। হিন্দুস্তানী রাগ সংগীতের একজন প্রাণপুরুষ ওস্তাদ বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার হাত ধরেই সংগীত জীবনে পথচলা শুরু করেন তিনি।

পল রোবসনের প্রতি ছেলেবেলা থেকে মোহ ছিল ভূপেনের। গান শুনে তো বটেই, তাঁর সংগ্রামের ইতিহাস জেনে সেই মোহ ভালোবাসায় রূপ নেয়। নিগ্রো বলে, এবং একজন প্রতিবাদী বলে আমেরিকা থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলতে চেয়েছে রাষ্ট্র। হলিউড থেকে বিতাড়িত হয়েছেন তিনি। স্টেজশো করতে গিয়ে বারবার বাধা পেয়েছেন।

রেকর্ড কোম্পানীগুলি তাঁর গান প্রকাশ করতে অনীহা প্রকাশ করেছে, নিজেদেরই ভবিষ্যত চিন্তা করে। এই পল রোবসন ভূপেনের পড়াকালীন সময়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন, যথারীতি প্রিয় শিল্পীকে কাছ থেকে দেখে, তাঁর সঙ্গে কথা বলে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি, মুগ্ধতায় ডুবে যান। সেই ঘটনার প্রভাবেই লেখা হয়, 'ওল ম্যান রিভার' এর অনুকরণে অসমিয়া ভাষায় 'বিস্তীর্ণ দুপারের'। যদিও অসমিয়া থেকে গানটির বাংলা অনুবাদ করেছিলেন শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা অনুবাদটি-

বিস্তীর্ণ দু'পারের অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও
নিঃশব্দে নীরবে, ও গঙ্গা তুমি, ও গঙ্গা বইছ কেন?
নৈতিকতার স্খলন দেখেও, মানবতার পতন দেখেও
নির্লজ্জ অলসভাবে বইছ কেন?
সহস্র বরষার উন্মাদনার মন্ত্র দিয়ে লক্ষ জনেরে
সবল সংগ্রামী, আর অগ্রগামী করে তোলো না কেন?
জ্ঞানবিহীন নিরক্ষরের, খাদ্যবিহীন নাগরিকের
নেতৃত্ববিহীনতায় মৌন কেন?
সহস্র বরষার উন্মাদনার মন্ত্র দিয়ে লক্ষ জনেরে
সবল সংগ্রামী, আর অগ্রগামী করে তোলো না কেন?
ব্যক্তি যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্বরহিত
তবে শিথিল সমাজকে ভাঙো না কেন?
সহস্র বরষার উন্মাদনার মন্ত্র দিয়ে লক্ষ জনেরে
সবল সংগ্রামী, আর অগ্রগামী করে তোলো না কেন?
স্রোতস্বিনী কেন নাহি বও,
তুমি নিশ্চয়ই জাহ্নবী নও,
তাহলে প্রেরণা দাও না কেন?
উন্মত্ত ধারার কুরুক্ষেত্রের শর শয্যাকে আলিঙ্গন করা
লক্ষ কোটি ভারতবাসীকে জাগালে না কেন? (প্রকাশকাল : ১৯৬৯)

পড়াশুনো শেষে দেশে ফিরে ভূপেন হাজারিকা গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। মোটামুটি এই সময়েয়েই তিনি আসামের গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং আই পি টি এ র সক্রিয় কর্মী হিসেবে গণনাট্যের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নজরে পড়েন ভূপেন, হয়ে ওঠেন তাঁর প্রিয়পাত্র। গণসংগীত রচনাও চলতে থাকে তাঁর আর একইসঙ্গে চলে সারা আসাম ঘুরে ঘুরে বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, মঘাই ওঝাদের নিয়ে গানগুলি গেয়ে বেড়ানোর

প্রকল্প। মূল অসমিয়া থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন তাঁর গানগুলি মূলত শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ই। কলকাতায় এসে সেই গানগুলি রেকর্ড করেন ভূপেন হাজারিকা, আশ্চর্য সাড়া মেলে শ্রোতাদের থেকে। খেয়াল করা যায়, এই বাংলা গানগুলি যে বিশেষ কোন রাজনৈতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে রচিত তা নয়, সামগ্রিকভাবে শ্রমজীবী মানুষের কষ্ট, তাদের ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন, তাদের খিদে- এইগুলিকেই গানে রূপ দিয়েছেন ভূপেন। যেমন এই গানটি-

দোলা হে দোলা হে দোলা হে দোলা
আঁকাবাঁকা পথে মোরা কাঁধে নিয়ে ছুটে যাই
রাজা-মহারাদের দোলা এ দোলা।
আমাদের জীবনের, ঘামে ভেজা শরীরের
বিনিময়ে পথে চলে দোলা, এ দোলা।
হেঁইয়া না হেঁইয়া না হেঁইয়া না হেঁইয়া।

দোলার ভিতরে ঝলমল করে যে
সুন্দর পোশাকের সাজ
আর ফিরে ফিরে দেখি তাই
ঝিকমিক করে যে
মাথায় রেশমের কাজ
হায় মোর ছেলেটির উলঙ্গ শরীরে
একটুও জামা নেই খোলা
দু'চোখে জল এনে মনটাকে বেঁধে যে
তবুও বয়ে যায় দোলা।

দোলাবাহক এই পর্যন্ত নিজের যন্ত্রণার বিবরণ দেওয়ার পর, গানের শেষ স্তবকে তার মুখ ফুটে বেরিয়ে আসে মনের একান্ত ইচ্ছেখানি-

যুগে যুগে মোরা কাঁধে নিয়ে দোলাটি
দেহ ভেঙে পড়ে ও পড়ে।
চোখে ঘুম ঢুলুঢুলু রাজা মহারাজাদের
আমাদের ঘাম ঝরে পড়ে ও পড়ে।
ভালো করে পায়ে পা মেলা
হঠাৎ কাঁধের থেকে পিছলিয়ে যদি পড়ে
আর দোলা যাবে নাকো তোলা।

রাজা মহারাজাদের দোলা।
বড় বড় মানুষের দোলা। (প্রকাশকাল : ১৯৭৮)

আরেকটি গানেও বাস্তবের রূঢ় ছবি, সঙ্গে ভরসার কথাও-

শীতের শিশিরিভেজা রাতে
শিশিরে ভেজানো রাতে
বস্ত্রহীন কোনো ক্ষেতমজুরের
ভেঙে পড়া কুটিরের
ধিকি ধিকি জ্বলে থাকা তুষে ঢাকা আগুনের
রক্তিম যেন এক উত্তাপ হই।

শিশিরে ভেজানো রাতে
সংখ্যালঘু কোনো সম্প্রদায়ের
ভয়ার্ত মানুষের না ফোটা আর্তনাদ
যখন গুমরে কাঁদে
আমি যেন তার নিরাপত্তা হই।...

অন্য একটি গানে আবার সম্মুখসমরেরই আহ্বান-

আয় আয় ছুটে আয়
সজাগ জনতা।
আয় আয় নিয়ে আয়
নতুন বারতা।
রামের দেশেতে সেই রাবণ বধিতে
যায় যদি যায়...জীবনটাই যাক!
সংগ্রামে সেনাপতি থমকে দাঁড়ালে,
কী যে লাভ নিজেদের আস্থা হারালে,
সমাজের বৈরীকে চেনা হবে দায়।
(শোন) বুভুক্ষু শিশুদের আর্তনাদ
(সে যে) তিল তিল মৃত্যুর আনে সংবাদ।
সেই সংবাদ শুনেও বধির কেন
তুই করবি না কেন তোর শেষ প্রতিবাদ?
সংগ্রাম আরেক নাম জীবনের
ভীরুতা আরেক নাম মরণের

ত্রাস ভুলে মানবেরে নাশ করি আয়।

সাম্প্রদায়িক সাম্যের ওপর লেখা তাঁর একটি গানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে-

সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ চেতনাতে নজরুল
যতই আসুক বিঘ্ন বিপদ, হাওয়া হোক প্রতিকূল
এক হাতে বাজে অগ্নিবীণা, কণ্ঠে গীতাঞ্জলি
হাজার সূর্য চোখের তারায় আমরা যে পথ চলি...

এই সেই দেশ এখনো এখানে ওঠে আজানের ধ্বনি
গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটক আর শোনা যায় রামায়ণী
কবি কালিদাস ইকবাল আর গালিবের পদাবলী
হাজার সূর্য চোখের তারায় আমরা যে পথ চলি।

ধর্মবিদ্বেষের সঙ্গে সম্পর্কিত দেশভাগের মত রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। দেশভাগের ব্যথা ভূপেনের যে গানকে বিখ্যাত করেছে খুব, তা হল-

গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা।
ও আমার দুই চোখে দুই জলের ধারা-
মেঘনা যমুনা।
গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা। ...

এপার ওপার কোন্‌পারে জানিনা
ও আমি সবখানেতে আছি।
গাঙের জলে ভাসিয়ে ডিঙা
ও আমি পদ্মাতে হই মাঝি।
এপার ওপার কোন্‌পারে জানিনা
শঙ্খচিলের ভাসিয়ে ডানা
ও আমি দুই নদীতেই নাচি।
এপার ওপার কোন্‌পারে জানিনা
একই আশা ভালোবাসা
কান্নাহাসির একই ভাষা
দুঃখসুখের বুকের মাঝে একই যন্ত্রণা
একই যন্ত্রণা।
ও আমার, দুই চোখে দুই জলের ধারা মেঘনা যমুনা ।

ওই বছরেরই (১৯৭৮) আরেকটা 'হিট' এর কথা না উল্লেখ করলেই নয়। যদিও কোনো বিশেষ ইস্যু নিয়ে এ গান লেখা নয়!

মানুষ মানুষেরই জন্যে
জীবন জীবনেরই জন্যে
একটু সহানুভূতি কি
মানুষ পেতে পারে না? ও বন্ধু...
মানুষ মানুষকে পণ্য করে
মানুষ মানুষকে জীবিকা করে
পুরনো ইতিহাস ফিরে এলে
লজ্জা কি তুমি পাবে না? ও বন্ধু...

লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ১৯৭৮ এর সব গানই ভূপেন হাজারিকার বিখ্যাত হয়েছে, মানুষ সমাদর করে গ্রহণ করেছে সেগুলি। আমাদের মনে হয়, ১৯৭৭ এ বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসার ঠিক পরের বছর ভূপেন হাজারিকার এই গানগুলির প্রকাশ জনগণের কাছে শাসকের ভাবমূর্তি যেমন রক্ষা করেছিল তেমন লেখক- গায়ককেও এনে দিয়েছিল সুখ্যাতি। চাঁদ-ফুল-পাখির গান শুনে ক্লান্ত বাঙালির কাছে ভূপেন তখন এক নতুন অভিজ্ঞতা। তাঁর জীবনবোধের গান দিনবদলের স্বপ্ন দেখা বাঙালিকে আশ্রয় দিয়েছিল। যেমন এই গানটি-

মোর গাঁয়ের সীমানার পাহাড়ের ওপারে,
নিশীথরাত্রির প্রতিধ্বনি শুনি।
কান পেতে শুনি আমি বুঝিতে না পারি।
চোখ মেলে দেখি আমি দেখিতে না পারি।
চোখ বুঁজে ভাবি আমি ধরিতে না পারি।
হাজার পাহাড় আমি ডিঙুতে না পারি!

হতে পারে কোন যুবতীর শোক ভরা ব্যথা
হতে পারে কোন ঠাকুমার রাতের রূপকথা
হতে পারে কোন কৃষকের বুক ভরা ব্যথা
চেনা চেনা সুরটিকে কিছুতে না চিনি!

শেষ হল কোনো যুবতীর শোক ভরা ব্যথা
শেষ হল কোনো ঠাকুমার রাতের রূপকথা
শেষ হল কোনো কৃষকের বুক ভরা ব্যথা

চেনা চেনা সুরটিকে কিছুতে না চিনি!

মোর কালো চুলে সকালের সোনালী রোদ পড়ে
চোখের পাতায় লেগে থাকা কুয়াশা যায় সরে
জেগে ওঠা মানুষের হাজার চিৎকারে
আকাশ ছোঁয়া অনেক বাধার পাহাড় ভেঙে পড়ে।
মানবসাগরের কোলাহল শুনি
নতুন দিনের যেন পদধ্বনি শুনি।

পাশাপাশি আরেকটি নতুন দিন উদযাপনের গান ভীষণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল ভূপেন হাজারিকার। আর সেটি-

আজ জীবন খুঁজে পাবি, ছুটে ছুটে আয়।
আর মরণ ভুলে গিয়ে, ছুটে ছুটে আয়।
হাসি নিয়ে আয় আর বাঁশি নিয়ে আয়।
আজ যুগের নতুন দিগন্তে সব ছুটে ছুটে আয়।

মনের চড়াই পাখিটির বাঁধন খুলে দে
শিকল খুলে মেঘের নীলে আজ উড়িয়ে দে-
যত বন্ধ হাজার দুয়ার ভেঙে আয়রে ছুটে আয়।
আজ নতুন আলোর দিগন্তে সব ছুটে ছুটে আয়। ...

বাংলা সংগীতে ভূপেন হাজারিকার বিশেষত্ব এই, এমন একটা সময়ে বাংলা সঙ্গীত জগতে তাঁর আবির্ভাব, যখন গণনাট্যের ভূমিকা, গণনাট্যের গান মানুষ ভুলতে বসেছে। আধুনিক বাংলা গানের একঘেয়ে রোমান্টিকতার মাঝে ভূপেন হাজারিকা হাজির করতে পারলেন মানুষের রোজকার জীবনযুদ্ধের যন্ত্রণার কাহিনি। পশ্চিমবঙ্গের শাসকের প্রশ্রয়ও মিলল। সর্বোপরি ছিল এক অসামান্য কণ্ঠস্বর, তাতে মজে উঠল বাঙালি সহজেই। তীক্ষ্ণ অথচ লালিত্যপূর্ণ এক সংগীতভাষাও তিনি রপ্ত করেছিলেন; আর এই দিকটার জন্যই কৃষকই হোক, মজদুরই হোক বা মধ্যবিত্ত মানুষ- সকলের কাছেই পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। যদিও এই বাংলা গানগুলি কোনটাই তাঁর নিজের অনুবাদ নয়, তবু মূল অসমিয়া গানগুলির আক্ষরিক অনুবাদই করেছিলেন শিবদাস বন্দোপাধ্যায়, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়রা।

- প্রতুল মুখোপাধ্যায় (জন্ম : ১৯৪২)

নিয়মিত গান শেখার সুযোগ পাননি প্রতুল আর্থিক কারণে। গান শিখেছেন নিজের মর্জিমাফিক, মনের তাগিদে। পড়াশুনো করেছিলেন স্টাটিস্‌টিক্স নিয়ে। মাস্টার্সও করেন। ব্যাংক অফিসারের চাকরি পান। গ্রামীন শিল্পীরা তাঁর শিক্ষাগুরু, তাঁদের কথা বলার ধরণ তিনি মন দিয়ে খেয়াল করেন। পথপাশে বাউলের গান শুনে বাস থেকে নেমে পড়ার মত কান্ডও ঘটান! আবার পিট সিগার, জন লেননরাও তাঁর পছন্দের তালিকায়। দেশি গান, বিদেশী গান, লঘু চালের গান, বা গুরুগম্ভীর শাস্ত্রীয় সংগীত, অপেরা, মার্চিং সং, সারা বিশ্বের লোকগান- যেখানে যা ভালো লাগে, ভালো ছাত্রের মত নিজের মধ্যে ঢুকিয়ে নেন তিনি। এভাবেই চলে তাঁর শিক্ষা। এভাবেই এতকাল চলেছে।

প্রতুল মুখোপাধ্যায় প্রথমত গায়ক। দ্বিতীয়ত তিনি সুরকার, আর তৃতীয়ত তিনি গীতিকার। তবে গান লেখার কাজটিও যথেষ্ট ধ্যান দিয়ে, নিখুঁতভাবে করে থাকেন।

প্রথমত গায়ক বলার কারণ, তাঁর গান গাইবার নিজস্বতা, যা তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত। প্রতুল বাদ্যযন্ত্র ছাড়া সম্পূর্ণ খালি গলায় গান গান। একজন গায়ক হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া মানে কতখানি সাহসের পরিচয় দেওয়া, তা নিশ্চয়ই নতুন করে বলে বোঝানোর দরকার হয় না! বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে নেন না, কারণ এক, সুরের ওপর দখল সম্বন্ধে নিজের যথেষ্ট আস্থা আছে; আর দুই, বাদ্যযন্ত্রের আড়ালে গানের কথাগুলি না ঢাকা পড়ে যায়, সেই দিকটি খেয়াল রাখেন। বিভিন্নভাবে গানের কথাগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উচ্চারণ ক'রে, গানের অর্থ শ্রোতার মনে গেঁথে দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর গান, শুনে উপভোগ করার। ক্ষেত্র বিশেষে দেখেও, কারণ গানের সঙ্গে অনেকাংশেই জুড়ে দেন 'অভিনয়' তিনি।

এবার সংক্ষেপে 'সুরকার' প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কথা। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ভালোবাসার মানুষ', 'পাথরে পাথরে নাচে আগুন', 'আয় কালবৈশাখী হাওয়া', 'তার ঘর পুড়ে গেছে', প্রভৃতি কবিতায় সুরারোপ করেছেন তিনি; যেমন করেছেন শঙ্খ ঘোষের 'বাবরের প্রার্থনা'তেও, কিংবা মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'আমরা ধান কাটার গান গাই', 'বাঘের সঙ্গে কে ই বা আপোষ করে' তে। এছাড়া অরুণ মিত্রের 'তুই ছেঁড়া মাটির বুকে',

'আমি এত বয়সে গাছকে বলেছি'ও এই তালিকাভুক্ত। কবিতা বাদে অন্যের গানের সুরও তিনি করেছেন। পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "স্লোগান দিতে গিয়েই আমি চিনতে শিখি নতুন মানুষজন/ স্লোগান দিতে গিয়েই আমি বুঝতে শিখি, কে ভাই, কে দুশমন" গানটি, সমীর রায়ের বিখ্যাত "আলু বেচো, ছোলা বেচো, বেচো বাখরখানি/ বেচো না বেচো না বন্ধু তোমার চোখের মণি", অসীম মন্ডলের " ছোটো ছোটো দুটো পা ছোটো দুই হাত/ দু'টাকায় খেটে খায় ভোর থেকে রাত" এই শ্রেণিভুক্ত। মাও এর লেখা দ্বারা, মাও এর চিন্তাভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়। কমলেশ সেন এর অনুবাদ, মাও এর রচনার, তাতে সুর সংযোজন করতে দেখা গেছে প্রতুলকে, শুধু তাই নয়, নিজেও মাও এর বহু লেখা অনুবাদ করে সুরারোপ করে গেয়েছেন। যেমন 'লড়াই করো লড়াই করো', 'লাল কমলা হলদে সবুজ', 'যুদ্ধকে মুছে ফেলতে চাই', 'এই তপ্ত অশ্রু দিক শক্তি' প্রভৃতি গান এই শ্রেণির। তাঁর উপর চীনের প্রভাব এতদূর গিয়েছিল যে, চীনা সুরে বেঁধেছিলেন এই গানটি-

মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি
সেদিন সুদূর নয় আর।
দেখো লাল সূর্যের আলোয় লাল
পূর্ব সমুদ্রের পার।
দেখো আলো ছড়ায় দিগ্বিদিকে
কেটে যায় রাতের আঁধার।
লাল সূর্যের আলোকধারায়
করবে মাতৃভূমি মুক্তিস্নান।
উঠবে গেয়ে মুক্তির গান
যুগ যুগ নিপীড়িত মজুর কিষাণ। ...

এই পর্যায়ের আরেকটি গান তাঁর-

জন্মিলে মরিতে হবে রে, জানে তো সবাই।
তবু মরণে মরণে অনেক ফারাক আছে ভাই রে।
সব মরণ নয় সমান।
রক্তচোষার উসকানিতে,
জনতারই দুশমনিতে,
সারাজনম গেলে কেটে, মরণ যদি আসে-
ওরে সেই মরণের ভার দেখে ভাই পাখির পালক হাসে রে।

সব মরণ নয় সমান।
জীবন উৎসর্গ করে
সবহারা জনতার তরে মরণ যদি হয়
ওরে তাহার ভারে হার মানে ঐ পাহাড় হিমালয় রে।
সব মরণ নয় সমান।

নকশাল আন্দোলন দ্বারা বেশ প্রভাবিত ছিলেন প্রতুল। লিখেছিলেন-

দাবানল, জ্বলুক দাবানল।
দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক
বিপ্লবেরই দাবানল।
এই তপ্ত অশ্রু দিক শক্তি।
এই শোকের আগুন জ্বালাক দ্বিগুণ
চিরশত্রুর প্রতি ঘৃণার আগুন।
জ্বলুক জ্বলুক দাবানল।
শোনো শহীদের ডাক, সাহসী হও।
সংগ্রামের পথে সাহসী হও।
আত্মদানের পথে সাহসী হও।
হাজার বাধার পথে সাহসী হও।
উন্নতশির চলো জয়যাত্রায়,
হও মুক্তিপথে অবিচল।
সামনে মোদের কত বীর শহীদ
মুক্তিযুদ্ধে দিল জীবন বলি।
এসো তাদের পতাকা তুলে উর্ধ্বে,
তাদের রক্তচিহ্ন রেখে এগিয়ে চলি।

নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের সূত্র ধরেই ঝিমিয়ে পড়া গণসংগীতের ধারার নতুন জোয়ার আসে। জোয়ার আনেন প্রতুলরাই। লেখেন যা মনগত ইচ্ছে, ঠিক সেইটাই, কোনো ভণিতা না করে-

বড় সুখবর শুনিলাম বাঘা জোতদার মরিল নাকি?
গেরিল্লা কিষাণের ঘায়ে জোতদার মরিল নাকি?
চাপিয়া মোদের পরান, ছিল জগদ্দল পাষাণ!
কিষাণের এক ঘায়ে সে পাষাণভার সরিল নাকি?
পুরানো দিন নাই রে আর, দেখ রে জনতার বিচার।

সে বিচার, রক্তচোষা, কেমনে দিবি রে ফাঁকি?
কাঁপে শয়তানের বৈঠকখানা, হইল প্রভুর চোখ কানা।
দেশ করতে ঠাণ্ডা, হাতে ডান্ডা
পাঠায় পুলিশ সাদা খাঁকি।
বাহাদুর গেরিলা ভাই (আজ), যুদ্ধে সামিল জনতাই।
জলের মধ্যে মাছের মত লড়, জনতার সঙ্গে থাকি।

অনেক গান যে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের ঝুলিতে, নিজের লেখা, এমনটা নয়। তাদের মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় গানগুলি উল্লেখ করা হল, কিছু গানের কথা বলা হল না। যা বলা হল এবং যা হল না, সব মিলিয়ে একটা বিষয় চোখে পড়ে, প্রতুলের লেখাগুলির কোন ধারাবাহিকতা নেই। নকশাল আন্দোলন বাদ রেখে বলতে হয়, বিভিন্ন সময়ে কোনো বিশেষ প্রেক্ষিতে, বা কোন প্রেক্ষিত ছাড়া নিজের খেয়ালমত তিনি লিখে গেছেন। আসলে যা ঘটেছে তা হল, এমন সময়ে প্রতুল গানের দুনিয়ায় এসে পড়েছেন, সেই সময় রাজনৈতিক-সামাজিক নানা অনাচার মানুষ মানুষের ওপর চালিয়ে গেলেও, তাই নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলবার, বা সে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার লোকের অভাব ছিল। সাংগীতিক উপায়ে আন্দোলন সংঘটিত করার মত মানুষও, চল্লিশের এর দশকের বিনয় রায়ের মত, এ যুগে ছিলেন না। কাজেই, তিনি যা তিনি হতে পারতেন, তা হওয়া হয়নি। আর যে কথাটি না বললেই নয়, বাদ্যযন্ত্রের সহযোগ ছাড়া গান গাইবার সিদ্ধান্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবীর সভা- সমিতিতে চললেও, গ্রামে-গঞ্জে বিষয়টা তাঁর জনপ্রিয়তার হানিই ঘটিয়েছে।

আমাদের বর্তমান অধ্যায়ে গীতিকার নির্বাচনের ব্যাখ্যা হিসেবে আলোচনার শেষে এই কথা বলা যেতে পারে, তাঁদেরই নির্বাচন করা হয়েছে যারা ‘গণসংগীত’ এর ইতিহাসে বিভিন্ন কারণে বেশ প্রতিনিধিস্থানীয়। গণনাট্যের সূচনা পর্বে মূলত যিনি ট্রেনিং দিতেন, গান শেখাতেন, তিনি বিনয় রায়। তাই তাঁর নিজের লেখা গান বেশ কম। বিনয় রায়ের পাশে পাশেই থাকতেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, তিনি ছিলেন সলিল, দেবব্রত, হেমন্ত, সুচিত্রা সকলের বটুকদা। তিনি রচনাকার্যে বিনয় রায়ের থেকে ধনী, এই হিসেবে সলিল প্রমুখের পূর্বসূরী হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রকে নির্বাচন করা হয়েছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে বাছা হয়েছে লোকসংগীতের ফর্মে গণসংগীতকে পুনরাবিষ্কার করার জন্য। সলিল চৌধুরী এসেছেন গণচেতনার গানে নতুন ফর্মের সন্ধানকারী সফল ব্যক্তি হিসেবে। গুরুদাস পাল, রমেশ শীল, নিবারণ পণ্ডিতের পরিচয় তাঁরা কৃষক-মজদুর শ্রেণি, এঁদের নিজেদের জীবনযন্ত্রণা নিজেরাই গান গেয়ে কেমন করে বললেন, তার দৃষ্টান্তস্বরূপ নিবারণ পণ্ডিতকে রাখা হয়েছে আলোচনায়।

গণনাট্য ততদিনে বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেছে, ঘটে গেছে নকশালবাড়ির ঘটনাও, সেই সময় গণসংগীতকে আবার জনপ্রিয় করে তোলার কৃতিত্ব ভূপেন হাজারিকার। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ না হয়েও, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর মনে অদ্ভুত নাড়া দিয়েছেন তিনি, আচমকা। আর ভূপেন প্রমুখের অনুপ্রেরণায় তারও পরবরতীদের মধ্যে থেকে চেনা নাম হিসেবে বাছা হয়েছে প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে; শুভেন্দু মাইতিকেও নির্বাচন করা যেত, কিন্তু যেহেতু তাঁর একটি সাক্ষাৎকার আমাদের গবেষণানিবন্ধের 'পরিশিষ্ট' অংশে রয়েছে, তাই এক্ষেত্রে তাঁর কথা আর বলা হয়নি।

সূত্রনির্দেশ

১. মৈত্র জ্যোতিরিন্দ্র, "আমাদের নবজীবনের গান", *নবজীবনের গান ও অন্যান্য*, ইন্দিরা, কলকাতা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ঞ-ট

২. বিশ্বাস দেবব্রত, *জর্জ*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৩১-১৩২

৩. মৈত্র জ্যোতিরিন্দ্র, "আমাদের নবজীবনের গান", *জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র রচনাসংগ্রহ*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১২, পৃ. ১২৪

৪. বিশ্বাস হেমাঙ্গ, বিশ্বাস মৈনাক (সম্পা.), *উজান গাঙ বাইয়া*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৫-১৬

৫. ঐ, পৃ. ২৮

৬. ঐ, পৃ. ৩০-৩১

৭. চৌধুরী খালেদ, "গণসংগীতশিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস", *লোকসংগীতের প্রাসঙ্গিকতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৯২-৯৩

৮. চৌধুরী সলিল, “গণসংগীতের উৎস সন্ধানে”, গুপ্ত সমীরকুমার (সম্পা.), *রচনাবলী সলিল চৌধুরী,* মিলেমিশে, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩১৯-৩২০

৯. চৌধুরী সলিল, লাহিড়ী আসীষ ও অন্যান্য গৃহীত সলিল চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, গুপ্ত সমীরকুমার (সম্পা.), *রচনাবলী সলিল চৌধুরী,* মিলেমিশে, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩৮১

আধুনিক বাংলা গানে গণসংগীতের প্রভাব

একদিন ভোরবেলা ললিত রেওয়াজ করে বাইরে বেরিয়েছি। তখন আমরা বৈষ্ণবঘাটায় থাকি। বড় রাস্তার ওপারে খাল। দেখি-সেই খাল দিয়ে এক যুবকের মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে। জামাকাপড় পরা। পিঠে কী-একটা বেঁধা। সারা পিঠে রক্ত নিয়ে উপুড় হয়ে ভেসে ভেসে চলেছে। এ লখিন্দরের সঙ্গে নেই কোনও বেহুলা।

সাল ১৯৭০। নাকি '৭১। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে ক্যাজুয়াল কন্ট্র্যাক্টে প্রোডাকশান অ্যাসিসটেন্টের কাজ করছি। আমি ছিলাম ইংরেজি ভাষণ বিভাগে। একদিন টেপ এডিট করছি বিকেলের দিকে, এমন সময়ে সেই ঘরে পঙ্কজ সাহা এলেন। তিনিও তখন বোধ হয় প্রোডাকশান অ্যাসিসটেন্ট-যুববাণী বিভাগে। চাপা গলায় পঙ্কজদা বললেন-"সুমন, শুনে রাখ-তিমির মারা গেছে। আজ সন্ধেবেলা ওর মৃতদেহ পৌঁছে দেবে ওরা ওর বাড়িতে। যাদবপুরের দিকে সাবধানে যাস।"

...পঙ্কজদা, তিমির আর আমি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। তিমির বরণ সিংহ, আমার সহপাঠী (ও ছিল বাংলা বিভাগে) নকশাল আন্দোলনে যোগ দেয়। গ্রামে চলে গিয়েছিল। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। নৃশংসভাবে খুন হয় তিমির জেলখানায়। আমি তো চিরকাল গা-বাঁচানোর দলে। তিমির আমার চেয়ে ঢের বড়মাপের মানুষ ছিল।...

সাল ১৯৭১। আমি পরীক্ষা দিয়ে ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় কেরানির চাকরি পেলাম। তিনশো সাতষট্টি টাকা মাইনে। ল্যান্সডাউন রোড শাখায় যাচ্ছি কাজ করতে। যাদবপুরের এইট-বি বাস টার্মিনাসে ঢুকেছি-কোত্থেকে একটা লোক যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল। আমার পেটে পিস্তলের নলটা ঠেকিয়ে হিসহিস করে উঠল; "কিরে কোথায় যাচ্ছিস।"-সাদা পোশাকে পুলিশ। আমি তখন ধুতি পরতাম। ধুতি প্রায় খুলে যাবার জোগাড়। টিফিন বাক্সটা হাত থেকে পড়ে গেল মাটিতে। রুটি তরকারি ছিটকে পড়ল। মহা আনন্দে উড়ে এল কয়েকটা কাক। লোকটা কয়েকটা গুঁতো মারল আমার পেটে। আমি অফিস যাচ্ছি, কোথায় অফিস ইত্যাদি জেনে নিয়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল; "যাঃ ভাগ।" বোধ হয় কাউকে খুঁজছিল লোকটা।

"এ কোন সকাল, রাতের চেয়েও অন্ধকার।" -গানটি শুনে মনে হয়েছিল জটিলেশ্বরবাবু অন্তত আমাদের সময়টাকে ধরতে চেষ্টা করলেন আধুনিক গানে।[১]

এ কাহিনি কবীর সুমনের। সঙ্গীতের আবহে বেড়ে ওঠা সুমন গান পেয়েছেন রক্তে। তুমুল বৃষ্টির সন্ধে মুখর হয়ে উঠছে বাবা-মায়ের মিলিত গানে, যৌথ কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান মিশে যাচ্ছে বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে-এ ছবি অনন্য ঠিকই, সুমনের কাছে বহু চেনাও বটে। হবে না ই বা কেন! সুধীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এককালে বেতারে গাইতেন নিয়মিত, আধুনিক বাংলা গানের রেকর্ডও ছিল তাঁর বেশকিছু। 'ভুলে যেও মোর গান', 'ফেলে দাও প্রিয় বাসি বাসরের মালা', কিংবা 'তুমি কি দেখেছ প্রিয়, কৃষ্ণচূড়ার ফুলে বনানী গিয়েছে ছেয়ে' গানগুলি বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল জানা যায়। অন্যদিকে উমা চট্টোপাধ্যায়ের ঝোঁক মূলত ছিল রবীন্দ্রগানে আর কীর্তনে; আধুনিক বাংলা গানও গাইতেন অবশ্য। যদিও একটা সময়ের পর দুজনই পেশাদারি গানবাজনা মুলতুবি রাখেন, বাড়িতে কিন্তু জিইয়ে রাখেন রবীন্দ্রনাথ, হিমাংশু দত্ত, নজরুলের গানের চর্চা। এ ই তো ঢের, গানের কান তৈরির জন্য, এমন পরিবেশ, যেখানে বাবা নিয়ম করে গান শেখাতে বসেন, ভুলভ্রান্তি হলে জোটে বেজায় ধমক, বাবার সূত্রেই বাড়িতে আসেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, পঙ্কজ মল্লিক, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্ররা; ছেলেবেলা থেকেই সখ্য জন্মায় হারমোনিকার সঙ্গে, টাইসোকোটোর সঙ্গে। ক্রমে দিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠ, রোবসনের অতলস্পর্শী আওয়াজে বিভোর হয়ে পড়েন সুমন, মুগ্ধতা বাড়ে হেমন্তর উচ্চারণ আর গায়কীর প্রতি। প্রথাগতভাবে শিখতে থাকেন খেয়াল, ভজন, রাগপ্রধান, বিভিন্ন ধারার বাংলা গান। এভাবে কৈশোরবেলা কাটে, সদ্য যৌবনে এসে পড়েন তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইংরেজি সাহিত্যের পাঠ নিতে। কবিতা তাঁকে দখল করে বসে আচমকা! আর আচমকাই ভাবনার জগৎ এক খুলে যায় যেন! ৬৬র পরপরপই সে সময়টা। ভারি অস্থির সেসময়, ভারি আশ্চর্য সে সময়, নিশ্চিন্তি দেয়নি এক মুহূর্ত, অবিরাম প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে শুভচেতনাসম্পন্ন মানুষের অস্বিত্বকে। ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম, লাতিন আমেরিকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে চে গেভারার মৃত্যু -বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চ তখন সরগরম সবে মিলে। অহরহ গুলির আওয়াজ কলকাতাতেও। ইতিউতি মাওয়ের উদ্ধৃতি, কাঁচাপাকা হাতে লেখা অজস্র দেওয়াললিপি, স্লোগান, পুলিশের ধরপাকড়। আজকাল সুমন স্মৃতি রোমন্থন করেন-

...পত্র-পত্রিকায়, লিটল ম্যাগাজিনে, কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে, ইস্তাহারে, দেওয়ালে দেওয়ালে, নতুন নাটকে, কিছু উপন্যাসে, সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে, মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ'-এ সময়ের ছবি, সমকালের কথা, ধ্বনি, ভাবনা, উচ্চারণ। কিন্তু বাংলা গান?[২]

ছিল কিন্তু গান ঢের। সমসময়ের কথা বলা। যেমন? ধরা যাক অজিত পাণ্ডের গলায় বিখ্যাত হওয়া এই গানটি-

লক্ষ কণ্ঠে গর্জে উঠেছে 'মুক্তি চাই!'
লক্ষ প্রাণের দৃপ্ত ঘোষণা 'শান্তি চাই!'
'মুক্তি চাই! শান্তি চাই! মুক্তি চাই!'
মোরা মুক্তি চাই!
দুশমনের ঘুম কেড়ে নেয়-
একটি নাম 'ভিয়েতনাম'!
অত্যাচারীর খুন ঝরায়-
একটি নাম 'ভিয়েতনাম'!

কিংবা দিলীপ বাগচীর লেখা-

ও নকশাল...অক্ত ঝরে-
সেই অক্ত হইতে জন্ম নিবে
জঙ্গল সাঁওতাল বাংলার ঘরে ঘরে।

তাহলে? যেমন এই গানগুলি, তেমনই অশান্ত ষাট-সত্তরের "আগুন লেগেছে, অগ্নি ঝড়-/কখনো এখানে, কখনো সেখানে", "ওকি ও হো রে ইন্দিরা, তুই করলু মোক ঘরের বাহিরা", বা বিখ্যাত 'তীর' নাটকে যুক্ত হওয়া, নকশালবাড়ি আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ নেওয়া শুকরা ওরাওঁ এর তরতাজা গান "সর্ সর্ সর্ সর্ হাওয়া আয়ী/ লালঝাণ্ডা উড়ী ফর্ ফর্ কী/ লড়াই কে ময়দান", কিংবা "তরাই জ্বলে গো, জ্বলছে আমার হিয়া"র মত অগুনতি গান কি সুমনের শোনবার অভিজ্ঞতায় ছিলই না একেবারে? সুমনের মত সংগীতরসিক ও সংগীতবিশ্লেষক সম্বন্ধে এ কিন্তু বেশ কষ্টকল্পনা! খেয়াল করা যাক এই জায়গায়, সুমন মুখে বলছেন, আক্ষেপ করছেন এই বলে যে, 'আধুনিক গান' এ

সমকালীনতার প্রভাব শূন্য বা অভাব সাঙ্ঘাতিক! সেই জায়গাটাই পূরণ করলেন যিনি, তাঁর মতে তিনি জটিলেশ্বর। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, পূর্বোক্ত গানগুলি, যেগুলির পরিচয় 'গণসংগীত' নামে, 'আধুনিক বাংলা গান' এর সঙ্গে তার বিরোধের জায়গাটা সুমন বিশ্বাস করছেন। আত্মজীবনীতে বলছেন নিজের সঙ্কট-

> গান নিয়ে কী করা যায়- এই ভাবনা আমার মাথায় অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছে লেখালেখির ধান্দার সঙ্গে। এমন সময় আমার এক পুরনো বন্ধু অমিত রায় আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন তাঁদের গণসংগীতের দল 'সমতান' এ। গণসংগীতের সঙ্গে আমার কোনদিনই কোনও নিবিড় সম্পর্ক ছিল না। তবু গেলাম- অনেকে মিলে গানবাজনা করার টানে...
>
> 'সমতান' এ অমিত রায়, বাবলু নিয়োগী সমেত কয়েকজন প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীর দেখা পেলেও গণসংগীত আমার চাহিদা মেটাতে পারল না। 'সমতান' এর শিল্পীরা ভালো গাইছিলেন। সমবেত কণ্ঠে জোরালো গান। অমিত রায় নিজে সংগীতরসিক ও সুগায়ক। বাবলু নিয়োগী নিষ্ঠার সঙ্গে লোকসংগীত শিখেছেন। পরবর্তীকালে 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা' যাঁরা দেখেছেন, মূল গায়েন হিসেবে বাবলুর দক্ষতার পরিচয়ও তাঁরা পেয়েছেন। না, সংগীতের প্রয়োগের দিক দিয়ে 'সমতান' এ কোনও আড়ষ্টতা ছিল না।
>
> আমার অসুবিধে হচ্ছিল অন্য কারণে। যে গান আমি গাইব বাজাব, তা আমার বাস্তব অবস্থার কথা, অবস্থানের কথা বলবে। আমি নাগরিক মধ্যবিত্ত। শ্রমিক কৃষকের নিত্যজীবনে কোথাও আমি তাঁদের শরিক নই। গ্রামে-গঞ্জে আমি কোনদিনও কোথাও তাঁদের শরিক নই। গ্রামে-গঞ্জে আমি কোনদিনও বাস করিনি। নগরজীবনটাই আমার চেনা। এ ব্যাপারে আমার কোনও হীনমন্যতা নেই। আমার জন্মের আগে কেউ আমার মতামত নেয়নি- আমি আদৌ জন্মাতে চাই কি না, কোথায়, কোন্ শ্রেণিতে জন্মাতে চাই ইত্যাদি।[৩]

এরপর 'সমতান' ছেড়ে বেরিয়ে আসেন সুমন। সালটা ১৯৭৯। 'সমতানে'রই প্রাক্তন সদস্য সুভাষ বাগচী, তাপস মাইতি, শিবশঙ্কর গুপ্ত, গীতশ্রী বসু, গোরা- এঁদের নিয়ে তৈরি করেন নতুন গানের দল, 'নাগরিক'। গীতিকার, সুরকার কমল সরকার, অ্যাকর্ডিয়ানবাদক শোভন মুখোপাধ্যায় যোগ দেন এই দলে। প্রথম দিকে কমল সরকারের গণসঙ্গীত আঙ্গিকের গান গাইত 'নাগরিক'। এরপর সুমন একে একে লিখতে থাকেন 'ভালো লাগছে না অসহ্য এই দিনকাল', 'তোমার আমার স্বাধীনতা', 'তোমাকে ভাবাবই ভাবাব' প্রভৃতি গান। প্রত্যেক সমাজেরই লোকগান থাকে যদি, তাহলে নাগরিক বাঙালির লোকগান কই,

নগরসমাজের নাগরিকরাও তো 'লোক'- এই প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজতে গিয়ে, এবং সমাধানের উপায় বার করতে গিয়ে সুমন অনুভব করেন "নাগরিক বাঙালিকে যদি গানের মধ্যে দিয়ে তার জীবনকে ধরতে ও ফুটিয়ে তুলতে হয় তবে আধুনিক গানকেই হতে হবে তার বাহন।"[৪]

কিন্তু বিষয় হল, গণসংগীতের ফর্মটাকে পছন্দ করে উঠতে না পারলেও, নিজের লেখা আধুনিক গানে শ্রেণিহীন সমাজ, সাম্যবাদের স্বপ্ন, বিক্ষোভ, বিপ্লবকে খুব একটা এড়িয়ে যেতে পারলেন না সুমন। বিশ শতকের শেষ দশকে তাঁরই হাত ধরে 'প্যানপ্যানে', 'ন্যাকা' আধুনিক বাংলা গান নবজন্ম পেল, হয়ে উঠল সময়োপযোগী; এ কথা বহুচর্চিত, বহুআলোচিত এবং সত্য। গানের পর গানের উদাহরণ দিয়ে সুমনের গানে গণসংগীতের প্রভাব দেখানো এই অধ্যায় রচনার অন্যতম উদ্দীষ্ট। 'গণসংগীত'কে হেমাঙ্গ বিশ্বাস যেভাবে ব্যাখ্যা করেন-

> সংস্কৃতি ও গণসংস্কৃতির মধ্যে বিশেষ চরিত্রগত তফাত রয়েছে। সংস্কৃতি হচ্ছে সংস্কার বা অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি-শিল্প ইত্যাদির উৎকর্ষ। এর উদ্দেশ্য নিছক নান্দনিকও হতে পারে। কিন্তু এই শব্দটির সঙ্গে গণ যুক্ত করে আমরা শব্দটিকে অন্য এক তাৎপর্যে নিয়ে যাই। তখন তা যুক্ত হয় খেটে খাওয়া মানুষের প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে। তখন তা মানুষের মর্মের কথাই বলে এবং একটি বিশেষ উদ্দেশে তা চিহ্নিত হয়। গণসঙ্গীত গণসংস্কৃতিরই একটি দিক।[৫]

আধুনিক গানের সে অর্থে কোন সংজ্ঞা হয় না। নির্দিষ্ট একটা সময়ের পরবর্তী যে গান লেখা হয়েছে তা সবই 'আধুনিক'। তবে চোখে পড়ে 'গানের ভিতর দিয়ে' গীতিসংকলনের গোড়ায় 'আধুনিক গান' সম্বন্ধে সম্পাদকের দেওয়া কিছু তথ্য-

'বেতার জগৎ' প্রথম বর্ষের যোড়শ সংখ্যায় অনুষ্ঠান-পরিচিতিতে কোনো একদিনের গানের অনুষ্ঠানে 'আধুনিক বাংলা গান' অভিধাটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। দিনটি ছিল ১৯৩০ সালের ২৭ এপ্রিল। শিল্পী ছিলেন হৃদয়রঞ্জন রায়। এর আগে 'বেতার জগত' এ বাংলা গানের অনুষ্ঠানে 'সাধারণ বাংলা গান', 'কণ্ঠসংগীত' প্রভৃতি নাম ব্যবহারের চল ছিল। এরপর ঐ এপ্রিলেই ৩০ তারিখ পঙ্কজ কুমার মল্লিক, ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অনুষ্ঠানে আবার 'আধুনিক বাংলা গান' এই শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়। তারপর থেকে 'আধুনিক বাংলা গান' কথাটি চালু হয়ে যায়।

তবে স্বপন সোমের বক্তব্যের সঙ্গে মেলেনা এমন একটি কথাও এ প্রসঙ্গে প্রচলিত। শোনা যায়, ১৯২৭ সাল নাগাদ ঢাকা রেডিও থেকে 'আধুনিক বাংলা গান' কথাটি প্রথম ইথারে ভেসেছিল।

তবে এ কথা না বুঝতে পারার নয়, 'আধুনিক বাংলা গান' আর 'বাংলা গানে আধুনিকতা'- র ভিতর ফারাক বিস্তর। আধুনিকতায় রবীন্দ্রনাথের সমান কেউই নন- এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ বোধ হয় কেউই করবেন না; তবু তাঁর গান 'আধুনিক বাংলা গান' নয়। নয় দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত বা অতুলপ্রসাদের গানও। নজরুলের গানও নয়। কারণ প্রধানত, এই গানগুলির রচয়িতারা কেবল গীতিকার নন, প্রকৃতিগতভাবে কবি, সুরকার আর গায়কও বটে। আর এই কারণেই এঁরা প্রত্যেকে পৃথক, নিজস্ব ঘরানার অধিকারী, যে ঘরানাগুলিকে আমরা 'রবীন্দ্রসঙ্গীত', 'দ্বিজেন্দ্রগীতি', 'কান্তগীতি', 'অতুলপ্রসাদী', 'নজরুলগীতি' নামে চিনি। নজরুলের পর ব্যাপারটা দাঁড়াল এমন, গানের কথা লেখেন একজন, একজন তাতে সুর দেন, গানটি গান আরেকজন। ততদিনে বাজারে রমরম করে চলছে গ্রামোফোন রেকর্ড (আবির্ভাব ১৯০৭ সালে), ১৯২৭ নাগাদ এসে গেছে রেডিও, আর ১৯৩০ থেকে শুরু হয়েছে সবাক চলচ্চিত্রের জমানা। ফলে নতুন গানের চাহিদা তখন তুঙ্গে। এই সময় তাই উঠে আসেন বেশ কিছু পেশাদার গীতিকার, সুরকার, গায়ক-গায়িকা; যাঁদের হাতে জন্ম নেয় 'আধুনিক বাংলা গান' নামক সংরূপটি। শ্যামল গুপ্ত, সজনীকান্ত দাস, হীরেন বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলেন রায়, অজয় ভট্টচার্য, বাণীকুমার, সুবোধ পুরকায়স্থ, অনিল ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ, প্রণব রায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার প্রমুখ ছিলেন গীতিকার আর সুরকারদের মধ্যে ছিলেন হিমাংশু দত্ত, রাইচাঁদ বড়াল, হীরেন বসু, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজ মল্লিক, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, অনিল বাগচী, অনুপম ঘটক, রবীন চট্টোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ীরা। গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন কাননবালা, কে.এল.সায়গল, পঙ্কজ মল্লিক, উমাশশী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, আঙুরবালা, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া, শৈল দেবী, যূথিকা রায়, সাবিত্রী ঘোষ, জগন্ময় মিত্র, শচীনদেব বর্মণ- এঁরা। একেবারে জন্মলগ্নের জনপ্রিয়তা পাওয়া কিছু আধুনিক গান প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে-

ক। “ফেলে যাবে চলে জানি জানি/ জানি জানি গো/ তবু ঝটিকারে ঝরা পাতা মোর/ জানায়ে মরম বাণী...” কথা- প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুর- কমল দাশগুপ্ত, শিল্পী- কানন দেবী

খ। “নাই বা ঘুমালে প্রিয়, রজনী এখনো বাকী/ প্রদীপ নিভিয়া যাক, শুধু জেগে থাক তব আঁখি...” কথা- প্রণব রায়, সুর- সুবল দাশগুপ্ত, শিলী- কে.এল.সায়গল

গ। “তোমারই মুখপানে চাহি, আমারই আঁখি মূরছায়/ আপনমনে তরীখানি, বাহিয়া বেলা বহে যায়...” কথা- মনোজ ভট্টাচার্য, সুর- হিমাংশু দত্ত, শিল্পী- সাবিত্রী ঘোষ

ঘ। “কতদিন দেখিনি তোমায়, তবু মনে পড়ে তব মুখখানি/ স্মৃতির মুকুলে মম, আজও তব ছায়া পড়ে রানী...” কথা- প্রণব রায়, সুর- কমল দাশগুপ্ত, শিল্পী- কমল দাশগুপ্ত

ঙ। “মেনেছি গো, হার মেনেছি/ তব পরাজয়ে মোর পরাজয়/ বারেবারে তাহা জেনেছি...” কথা- সুবোধ পুরকায়স্থ ,সুর- কমল দাশগুপ্ত, শিল্পী- জগ্নময় মিত্র

চ। “ভালোবাসা মোরে ভিখারী করেছে/ তোমারে করেছে রানী/ তোমারই দুয়ারে কুড়াতে এসেছি/ ফেলে দেওয়া মালাখানি...” কথা- মোহিনী চৌধুরী, সুর- কমল দাশগুপ্ত, শিল্পী- জগন্ময় মিত্র

ছ। "সেদিন যখন প্রথম বৃষ্টি এল/ তুমি বাতায়নে ছিলে একা, মনে কি পড়ে?” কথা- গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর- রবীন চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী- রবীন মজুমদার

জ। “সে নিল বিদায়/ না-বলা ব্যথায়/ আমি ছিনু অভিমানে/ রজনীগন্ধা জানে” কথা- অজয় ভট্টাচার্য, সুর- অজ্ঞাত, শিল্পী- কানন দেবী

ঝ। “ তুমি যাহা চাও/ সে তো আমি নহি গো/ ভুলে দেওয়া মালা তব/ আঁখিজলে বহি গো” কথা- সুবোধ পুরকায়স্থ, সুর- শৈলেশ দত্তগুপ্ত, শিল্পী- বেচু দত্ত

গানগুলির প্রথম দু-চার পংক্তি, যা এক্ষুনি উল্লেখ করা হল, সেগুলি থেকেই প্রতিটা গানের বাকি অংশের বক্তব্যও অনুমান করা যায়। এই অনুমানে কারোর ভুল হবে না, তা ও বলা যায় নিশ্চিত করে। আরো শত শত গান উল্লেখ করেও দেখানো যায়, এই গানগুলির মূল বক্তব্যবিষয়, এক এবং একটিই! প্রেমের উল্লাস, না হয় ব্যর্থ প্রেম, বিরহ, নয় তো প্রেমের স্মৃতি! সময় গড়িয়েছে ঢের, তবু 'আধুনিক বাংলা গান' তার চেনা বেষ্টনী ছেড়ে বেরতে পারেনি! আজ অবধিও না! -এই কথাটা যতখানি আমাদের, অনেক বেশি

সমালোচকদের। সরাসরি অভিযোগ জানাচ্ছেন প্রত্যেকে- কেমন, দেখে নেওয়া যাক কিছু উদাহরণঃ

> আধুনিক গানে সমাজের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই। মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক বাস্তব সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রামের সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক নেই বললেই চলে এবং তা কেবলমাত্র আনন্দদান, অপার্থিব সুখ অনুভুতিসৃষ্টির কাজটুকুই করে।...এরা শতচ্ছিন্ন একঘেয়ে প্রেম নিবেদনের নানা ছলাকলার প্যানপ্যানানির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে আধুনিক গানের প্রতি অরুচি এনে দিচ্ছে। আবার 'বেশ করেছি, প্রেম করেছি, করবই তো' নারীকণ্ঠের এই অশালীন উদ্ধত উক্তি 'নারী স্বাধীনতা' এর প্রতি সমর্থন ও সহমর্মিতার পরিবর্তে উচ্ছৃঙ্খলতারই প্রকাশ ঘটায়। -দিলীপ সেনগুপ্ত[৬]

> বাংলা গানে ক্রমাগত যে ক্লিষ্ট ভাষা, বুদ্ধিহীন চমক এবং প্রতিভাহীন কবিত্বের নমুনা ক্রমাগত শ্রোতারা পেয়েছেন, তাতে তাঁদের চিত্তে কোনো আলোড়ন জাগেনি।...মনে রাখার আবেদন, ভাঙা প্রেমের ছড়াছড়ি, অন্য কোথাও চলে যাওয়ার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা,... পাখি নিয়ে ডাকাডাকি, ফুললতা আকাশ নিয়ে মাখামাখি-এমন শত শত ক্লিশে উজাড় করে, দিয়েছেন তাঁরা আধুনিক বাংলা গানের শ্রোতাদের ক্লান্ত করে। -অরুণকুমার বসু[৭]

> মান্না দে-র গাওয়া একটা গানের বাণী বেশ ভাববার মতো-'জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই/ পাছে ভালোবেসে ফেলি তাই/ দূরে দূরে রই...' পাড়ার একটেরে বিষণ্ণ কোণে ভীরু যুবকটিকে এ গানে পাই। মুখ ফুটে এরা এদের ভালোলাগার কথা, অধিকারের কথা, সবলে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেবার কথা বলতে পারে না, পারেনি-গানেও সেই পিছু হটার বাণী। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী বাঙালী সমাজে এমন ক্ষয়গামী, হতাশ, ভ্রষ্ট যুবমন্ডলী প্রচুর জন্মেছে-বাঙালী গীতিকারদের লক্ষ্য কি তারাই ছিল? সমাজবিজ্ঞানীর চোখে বাংলা গানের থিমেটিক অ্যানালিসিস হলে বোঝা যাবে, এ দেশের বারো আনা প্রেমের গান, সফলতার ও মগ্ন আনন্দের উচ্চারণ মেয়েদের জবানীতে লেখা; আর ব্যর্থতা, পেয়ে হারানোর দুঃখ, হতাশ্বাস অস্তিত্বের গান- পুরুষের জবানীতে লেখা। গানে জাগা ইন্দ্রধনু, মাধবী-মধুপের গীতালি, ঝনক ঝনক কনক কাকনের বাজনা, বালুকাবেলায় ঝিনুক খোঁজার ছলে গীতিময়কে খুঁজে পাওয়া বা মধুমলয়ার হিন্দোল-বাংলা গানে কেবল মেয়েদের জন্য ধার্য। -সুধীর চক্রবর্তী[৮]

অধিকারের কথা, সবলে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেবার কথা যে সমান্তরালভাবে বয়ে যাওয়া 'গণসংগীত'এর ধারার মধ্যে ছিল তীব্রভাবে, অনেক সংগীতবোদ্ধাই সেদিকটা জেনে বুঝেও 'আধুনিক বাংলা গান' ও 'গণসংগীত' এর মাঝের দেওয়ালটা শক্তপোক্ত করে তুলেছেন। সুমনও বুঝেছেন, বুঝে সে দেওয়াল ভেঙেছেন, খুব সচেতন ছিলেন তিনি এ বিষয়ে- তেমনটা নয়, সে কথা আগেই বলা গেছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা করার করেছেন

তিনি। এখানে সুমন ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমী ভাবনা আর কারা কারা ভেবেছেন- আমাদের বর্তমান অধ্যায় সেই খোঁজেই এগিয়েছে।

আমাদের এতক্ষণের এই গৌরচন্দ্রিকা, মূলত চল্লিশের বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদের আক্রমণ, দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারি, দাঙ্গা, স্বাধীনতার লড়াই, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতিকে আত্মস্থ করে জন্ম নেওয়া, দু'দশকে সংখ্যায় ও গুণমানে বিপুল ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ফেলা, ষাটের দশকে খানিক ঝিমিয়ে পড়া, ওই দশকেরই শেষের দিকে নকশালবাড়ি আন্দোলনকে ঘিরে ফের প্রাণ ফিরে পাওয়া, আর আজ একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রায় বিলীন হয়ে যাওয়া 'গণসংগীত' আর 'আধুনিক বাংলা গান' এর চিরকালীন দূরত্বের বিষয়টি স্পষ্ট করে নেবার জন্য। সেক্ষেত্রে সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা, সলিল চৌধুরীর সুর করা, প্রথমত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয়ত বিখ্যাততম আধুনিক গানের শিল্পী লতা মঙ্গেশকরের রেকর্ড করা, গণনাট্য সংঘের মঞ্চে অজস্রবার গাওয়া, ঐ মঞ্চেই নৃত্যশিল্পী শম্ভু ভট্টাচার্যের হাজারবার পারফর্ম করা 'রানার' গানটি কোন্ শ্রেণিভুক্ত-এ প্রশ্নের উত্তর যদিও সহজে মেলেনা। আমাদের লেখায় উল্লিখিত সুধীর চক্রবর্তীর বক্তব্য এইখানে ফিরে একবার যদি পড়া যায়, নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা হবে না, ঠিক কোন্ কোন্ গানের কথা বোঝাতে চেয়ে তার সঙ্গে কেবলই মেয়েদের প্রেমজনিত উচ্ছ্বাস, আনন্দ-আবেশ মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু প্রেমে প'ড়ে বা প্রেম ক'রে উৎফুল্ল হতে ছেলেদেরও তো দেখা গেছে! ওদিকে দিলীপ সেনগুপ্ত নারীকণ্ঠে 'বেশ করেছি, প্রেম করেছি, করবই তো' শুনে সমাজের নিদারুণ অবক্ষয়কেই এমন গানরচনার কারণ হিসেবে দেখালেন যখন, তখন এই দুজন বিষয়েই অনুমান করে নিতে হয়, এঁরা শচীনকর্তার কণ্ঠে 'শোন গো দখিন হাওয়া, প্রেম করেছি আমি/লেগেছে চোখেতে নেশা, দিক ভুলেছি আমি' বোধ হয় শোনেননি কখনও! আর যদি এই দুটো গানের উপস্থাপনাজনিত তফাতের কথাই ওঠে, তাহলে শচীনপুত্রের কম্পোজ করা, আর.ডিরই গলাতেই রেকর্ড করা 'শোনো, এই তো সময়, তুমি পাশে বোসো/ আমায় ভালোবাসো' গানটি তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কাজেই, প্রেমের প্রকাশ বিষয়ে এই লিঙ্গবিভাজনটা সংস্কারপ্রসূত নিশ্চয়ই, আদপে যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে প্রেমই যে গানগুলির কোষে কোষে- তা না মেনে উপায় নেই! তবে আর কিছুও ছিল, একথাই বলা হবে, যা একান্তই 'গণসংগীত'এর থেকে পাওয়া। 'গণসংগীত' এর সঙ্গে আধুনিক বাংলা গানের বন্ধুত্ব বহুকালই ঘটেছে আসলে, আমরা খেয়াল করিনি।

কোদালিয়ায় ছিল সলিল চৌধুরীর মামাবাড়ি। মামাবাড়ি থেকে হরিণাভি অ্যংলো-সংস্কৃত স্কুলে যাবার পথে পড়ত একটা মেথর পল্লী। রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকর্তারা ছিলেন

কংগ্রেসি ও গান্ধীপন্থী। অথচ তাঁদের হরিজন বিরোধী কাজ ক্লাস টেনের পড়ুয়া সলিলের নজর কেড়েছিল। মেথরদের আর্থিক দুর্গতি ও তাদের সামাজিক নিগ্রহের বিরুদ্ধে প্রবল শক্তিতে আন্দোলন শুরু করেছিলেন সুভাষগ্রামের নেতা লক্ষণ ভট্টাচার্য, যাঁর সংগ্রামী চেতনা ও তেজ সলিলকে উদ্দীপিত করেছিল। ক্রমে সলিলেরই উদ্যোগে ঐসব জঘন্য ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধে ছাত্রদল গড়া হল, মেথরপল্লীতে খোলা হল স্কুল। বিজয়া, রাখীবন্ধনের দিনে একসাথে খাওয়া-দাওয়া করে, বাঁশির সুরে মাতিয়ে রাখলেন তিনি ওদের। মেথরপল্লীর এই ঘটনা কী সাংঘাতিক প্রভাব ফেলেছিল সলিল চৌধুরীর রাজনৈতিক চেতনায়, সে কথা আত্মজীবনীতে শুনিয়েছেন তিনি আমাদের-

> মেথরদের যে স্ট্রাইক দেখে প্রথম চেতনা জাগল,তখন থেকেই বোধ হয় নতুন চোখে পারিপার্শ্বিক জগতকে দেখতে শুরু করলাম। মানুষের ওপর মানুষের কী চূড়ান্ত নির্যাতন, কী অপরিমেয় শোষণ, কী অন্যায় আর অবিচার! ছোটবেলা থেকে চাবাগানের শ্রমিকদের দেখেছি, কিন্তু হঠাৎ যেন তাদের নতুন চোখে দেখতে শিখলাম।...বলতে গেলে আমি এক কথায়ই কমিউনিস্ট হতে রাজি হয়ে গেলাম এবং সেই রাতেই ছেলেদের সঙ্গে লুকিয়ে পোস্টার লাগাতে বেরিয়ে গেলাম।[৯]

এভাবেই সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া সলিল লিখে চললেন একের পর এক গণচেতনার গান। পার্টির সাংস্কৃতিক কার্যাবলির গুরুদায়িত্ব অনেকাংশেই তাঁর ওপর বর্তাত, সেই ছিল তাগিদ। তাঁর অধিকাংশ গানই দারুণ জনপ্রিয়তাও পেল। কত গেল কালের গর্ভে হারিয়ে। সভা-সমিতির শেষে সংরক্ষণ করা হল না বলে। ছেচল্লিশের শেষের দিকে, উৎপাদিত ফসলের দুই তৃতীয়াংশ নিজেদের অধিকারভুক্ত করে রাখবার দাবীতে যে তেভাগা আন্দোলনের সূত্রপাত, সেই কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা সলিলের একটি গানের বেশ কিছু আক্রমণাত্মক ও জ্বালাময়ী শব্দ বাদ দিয়ে ১৯৫২ সালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে রেকর্ড করান সলিল। পূর্বতন রূপে আক্রমণের ভঙ্গীটি ছিল এরকম-

ও গাঁয়ের যত জোয়ান মরদ লাঠি নিও হাতে।
ঐ খুনে রাঙা ঝান্ডা যেন থাকে সবার সাথে।
আর দুশমন যদি আসে, যেন চোখের জলে ভাসে-
যেন লুটে খাওয়ার ক্ষুধা তাহার মেটে একেবারে!...

ও গাঁয়ের যত মা বোন আছ, তোমরা থেকো ঘরে।
ঐ আঁশবটি আর কাটারিটা রেখো হাতে করে!
যেন দালাল বেইমান যত, পায় শিক্ষা উচিত মতো!

বোঝে এই বাংলাদেশের মা বোন কত শক্তি হাতে ধরে!

প্রতিষ্ঠিত শিল্পী, যাঁরা গ্রামোফোন কোম্পানির অনুমোদন পান, তাঁদের মধ্যে থেকে হেমন্তকেই বেছে নিলেন সলিল, কারণ ততদিনে 'গাঁয়ের বধূ'র সাফল্য দেখেছেন সবাই। কিন্তু যেহেতু ততদিনে হেমন্ত পুরোদস্তুর বাণিজ্যিক শিল্পী, তাই ওইসব আক্রমণাত্মক কথায় বিশ্বাস রাখলেও তা রেকর্ড করতে ভয় পেলেন তিনি। তাছাড়া, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও গ্রামোফোন কোম্পানির মালিকানা বেশ কিছুদিন ছিল ইংরেজেরই হাতে আর কেন্দ্রীয়-রাজনীতির প্রভাবও ছিল কমিউনিস্টদের প্রতিকূল, কাজেই রেকর্ডের সময় গানের কথার সঙ্গে বেশ আপোষ করতে হল সলিলকে। প্রতিরোধ, লড়াই এর অংশটা মুছে গিয়ে কৃষকের দুঃখতেই থিতু হল গান-

আহা, কার ঘরে জ্বলেনি দীপ,
কে আছ আঁধারে?
আহা, কার বাছার জোটেনি ধান,
আছ অনাহারে?
আয় আয় মাটির টানে
কণ্ঠ ভরি গানে
মাটি মোদের মাতা, আমরাই তো বিধাতা
এই মাটিতে নবজীবনের রঙমহল বানাইরে।।

এই গানটিকেও যদি 'গণসংগীত' হিসেবেই ধরা হয়, তাহলে তার পঁচিশ বছর পর ১৯৭৭, বোম্বেতে ততদিনে সংগীত পরিচালক হিসেবে সলিল যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত, এদিকে পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক শূন্যই বলা চলে, সেই সময় লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে একটি আধুনিক বাংলা গান গাওয়ালেন তিনি, যার শেষ ক'পঙক্তি এরকম-

কার ঘরে প্রদীপ জ্বলেনি?
কার বাছার অন্ন মেলেনি?
কার নেই আশ্রয় এ বর্ষায়?
দিন কাটে ভাগ্যেরই ভরসায়।
তুমি হও একজন তাদেরই,
কাঁধে আজ তার ভার
তুলে নাও, তুলে নাও, তুলে নাও।

আজও পুজোপ্যান্ডেলে, এমনকি বিয়েবাড়ি(!)তেও শোনা যায় এ গান! আসলে বোধ হয়, সুরের চলন, মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট আর লতার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের বিশেষত্বে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এমন জম্পেস, বেশিরভাগ লোক কথাগুলি শুনেও দেখেননা! যদিও সলিলের উদ্দেশ্য ছিল উল্টো, 'আধুনিক গান' এর ধাঁচায় সর্বহারার যন্ত্রণার কথা বুনে সাধারণ শ্রোতার চৈতন্যকে উজ্জীবিত করা!

পার্টির সঙ্গে যোগাযোগহীনতার বহু পরও ১৯৮১ সালে সম্পূর্ণ আলাদা অ্যারেঞ্জমেন্টে রেকর্ড করে, দশটি পুরনো গণসংগীতকে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী শ্রোতার কানে পৌঁছে দিয়েছিলেন সলিল, অ্যালবামের নাম দিয়েছিলেন 'ঘুম ভাঙার গান'। যতই ফিল্মের গানে মজে তিনি উঠুন না কেন, যৌবনের উন্মত্ততার দিনগুলোর কাছে বারবার ফিরতেও তিনি চেয়েছেন। আক্ষেপও ছিল। ওই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনগুলো থেকে দূরে সরে যাবার। যেমন ধরা যাক এই গানটি, উৎপলা সেনকে দিয়েছিলেন, আধুনিক বাংলা গান-

প্রান্তরের গান আমার, মেঠো সুরের গান আমার,
হারিয়ে গেল কোন বেলায়, আকাশে আগুন জ্বালায়,
মেঘলা দিনের স্বপন আমার, ফসলবিহীন মন কাঁদায়।...

ক্লান্ত ডানায় নীড় খুঁজি, অথৈ নদীর তীর খুঁজি
শুধুই আমার যায় বেলা, ভাসায়ে আশার ভেলা,
অন্তবিহীন পথের পুঁজি!
অন্তরেরই সান্ত্বনায়।

এ গানের এই জায়গাটা খেয়াল করার বিশেষ করে- "মাঝে মাঝে উদাস হাওয়ায় এলোমেলো কী যে শুনি,/বুঝি কাহার ব্যথার ছোঁয়ায় হারায় আমার সুরের ধ্বনি"। চেনা জগত ছেড়ে বেরিয়ে আসার কষ্ট, নতুন জায়গায় মন না বসাতে পারার যন্ত্রণা আবার দেখা যায় এই জনপ্রিয় গানেও-

আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা-
আর কত কাল আমি রব দিশাহারা, রব দিশাহারা?
জবাব কিছুই তার দিতে পারি নাই, শুধু
পথ খুঁজে কেটে গেল এ জীবন সারা, এ জীবন সারা।

এই অস্থিরতার সঙ্গে প্রেমজনিত অস্থিরতাও মিলে গেছে কবে যেন! ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের জন্য তেমনই একটি গান বেঁধেছিলেন সলিল-

অন্তবিহীন এই অন্ধরাতের শেষ
কোথা যে তোমার সেই

চোখেরই আলোয় দেখা
সোনালী সাধের দেশ- কোথা যে তুমি?
খুঁজে খুঁজে ফিরি হায় রে হায়
শতেক আঁখি পল্লব ছায়-হায়!

তবু আশা ফুরোয় না তাঁর, প্রেমিকার হাতে হাত রেখে আলোক বিছানো পথে হাঁটবার। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য লেখেন সলিল-

আর দেরি নেই আমি আসছি, আমি আসছি,
আলো জ্বালব জ্বালব বলে
সূর্যের থেকে অগ্নিবন্যা নিয়ে আসছি গো
না ফিরে যেও না।...

গহন সঘন রাত্রি, কত না দিশাহারা যাত্রী
অসহায় জানি গো প্রিয়া কাঁদে জীবন ধাত্রী,
আর দেরি নেই, আর দেরি নেই, না ফিরে যেও না।

সলিলের বহু আধুনিক গানের মূল থিম মিলে যেতে দেখা গেছে বারবার। এক অনির্দেশের পথে যাত্রা করেছেন তিনি। চেনা ছক ছেড়ে বহু দূর তাঁর গন্তব্য। পথ তমসাছন্ন। অজস্র বাধা- বিপত্তি সেখানে। আর মনেও অপরিসীম দ্বিধা। তবু আশাদীপ জ্বেলে রাখতে ইচ্ছে করে, ভাবতে ভালো লাগে, একদিন সফল হবে এই পথচলা। কঠিন পথে সঙ্গ পেতে ইচ্ছে করে প্রিয়ার, ঠিক যেমনটা বলা আছে আগের গানে। আবার এমন একটা সময় আসে, যখন এইসব দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুনের রোমাঞ্চ উপভোগ করেন তিনি। যে কারো ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যেমন মিলিয়ে শোনা যায় গানগুলি, তেমনই কোন অনুষঙ্গ ছাড়া শুনতে গেলেও গণজাগরণের তেজ, হার না মানার শক্তির সঙ্গে তাদের মিল পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলা গানের প্রেমজনিত 'ন্যাকামি' র থেকে যা বহুদূর! ওইরকমই রোমাঞ্চ ভরা একটি গান, হৈমন্তী শুক্লাকে দিয়ে যা গাইয়েছিলেন তিনি-

এইবার স্বপ্নের বন্ধন খুললাম-
আর নেই দূর দূর বক্ষের স্পন্দন!
আশা নিরাশার ক্রন্দন (আহা)!
আর নেই সন্ধ্যার বাতায়নে চেয়ে নিঃশ্বাস,
তারা ভেঙে দেবে বিশ্বাস,
তাই ভেবে সন্দ দ্বন্দ্বকে ভুললাম (আহা)!
আর মিছে মোরে পিছু ডেকো না গো।...

দুঃখের বর্ষায় আমি মেঘে মেঘে
বিজুলির মতো তাই চমকাই,
কিছু নাই তাই মোর হারাবার কিছু নাই।
দুর্বার ঝঞ্ঝায় অন্তর প্রস্তুত
যত কাঁটা পায়ে পায়ে দললাম।

এই গানটির প্রকাশকাল ১৯৮৩। এর কুড়ি বছর আগে লেখা গানেও ছিল একই বক্তব্য মোটের উপর। সেখানেও জীবনের অনিশ্চয়তার সঙ্গে যোঝবার ইচ্ছে ছিল। ভীষণ জনপ্রিয়তা পেয়ে এসেছে গানটি চিরকালই-

আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা।
আমি কাঁদলাম,বহু হাসলাম, এই জীবন জোয়ারে ভাসলাম,
আমি বন্যার কাছে,ঘূর্ণির কাছে রাখলাম নিশানা...
আমি আবার কাঁদব হাসব, এই জীবন জোয়ারে ভাসব-
আমি বজ্রের কাছে মৃত্যুর মাঝে রেখে যাব নিশানা।

আবার এই উদ্যমে কখনো কখনো দেখা দেয় ভাঁটা। মনে হয় বুঝি সেই সব পেয়েছির দেশ না দেখাই থেকে যাবে চিরকাল। তখন লেখেন সলিল-

ক্লান্তি নামে গো, রাত্রি নামে গো।
বাইতে পারি না যে তরণী,
আর কত দূর?

হায়, কোথায় শ্যামল মাটির মায়া,
হায়, কোথায় সবুজ বনের ছায়া,
কোথা সে নীড়, গভীর প্রেমের মোহানা,
আহা, কোথায় সে তীর?

হারিয়ে যাওয়া উৎসাহ ফিরে আসে ফের, শ্রান্তি ভুলে গিয়ে আবার পথে নামেন তিনি, কারণ স্বপ্নলোকের নেশা তখনো চোখে। কান্ডারীকে হাঁক দিয়ে লেখেন-

হেঁইয়ো হো হো হেঁইয়ো-
ও মাঝি ভাইও, বাইয়ো রে নাও বাইয়ো
খর নদীর ওপারে স্বপ্নের দেশে যাইও।
হেঁইয়ো- আকাশে আজি বাদল বড় ভারি
হেঁইয়ো- ঢেউয়ের তালে তুফান নাচে মরণ মহামারী,
হেঁইয়ো হো, বল মাভৈঃ যাবই খর নদীর পারে।

একটি বিষয় এই গানগুলি নিয়ে আলোচনা করবার সময় খেয়াল করার মত। প্রেমকে ন্যাকামি থেকে মুক্তি দিয়েছেন সলিল তাঁর গানে। ধরা যাক এই গানটি, যার প্রথম স্তবকে প্রেমিকার প্রতি মুগ্ধতাই কেবল-

শোনো, কোন একদিন-
আকাশ বাতাস জুড়ে রিমঝিম বরষায়।
দেখি, তোমার চুলের মত মেঘ সব ছড়ানো,
চাঁদের মুখের পাশে জড়ানো।
মন হারাল, হারাল মন, হারাল- সেইদিন।

দ্বিতীয় স্তবকে গিয়ে দেখা যায়, প্রেমিকটি একলা পথ হাঁটছেন, উদ্দেশহীন সে চলা, তবু কোনও সংগ্রামের অংশীদার তিনি, তাই এই পথচলাও ফেলনা নয়! সেই দিনের সেই একলা চলায় প্রেমিকা নেই কাছে, কিন্তু তার স্মৃতি রয়ে গেছে, সেই সূত্রেই ফের হারিয়ে যাচ্ছে মন! বিপ্লব আর প্রেম এভাবেই মাখামাখি হয়ে যায় এ গানে-

আরো একদিন, তামসী তমস্বিনী রাত্রি।
ঘুম ঘুম নিঝুম, জীবন পথের সব যাত্রী।
আমি একেলা, চলেছি নিরুদ্দেশ যাত্রী!
রাতজাগা এক পাখি, শুনি জীবন জয়ের গীত গাত্রী।
মনে হল দুখরাতে যেমন করে ভোলাতে।
মন হারাল, হারাল মন, হারাল- সেই দিন।

একসময় এই পথ অনিবার্যভাবে যায় হারিয়ে, কিন্তু পথ হারানোর নেশা পেয়ে বসে সলিলকে। যেমন করে আচমকা কারও গান, আচমকা কারও কথা মনে পড়ে ভালো লাগে, কেবলই মনে করতে ইচ্ছে করে; তেমনই সোজা, চেনা-জানা পথে হাঁটতে গিয়ে আচমকা কোনদিন হারিয়ে যাওয়ার কথা ভেবে কেবলই হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে তাঁর-

সে যে গান শুনিয়েছিল হয়নি সেদিন শোনা
সে গানের পরশ লেগে হৃদয় হল সোনা,
রাগের ঘাটে ঘাটে তারে মিছেই সেধেছি
সুর হারাব বলেই সেতার সুরে বেঁধেছি
সোজা পথের ধাঁধায় আমি অনেক ধেঁধেছি।
পথ হারাব বলেই এবার পথে নেমেছি।

একথা মেনে নিতে অসুবিধে কোথাও নেই আমাদের যে, এই গানগুলিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক; লাঞ্ছিত, নিপীড়িত জনের বেদনার স্পষ্ট ছবি মেলে না, যেমনটা ‘গণসংগীত’ এ মেলা দস্তুর, কিন্তু খুব শান্ত, স্নিগ্ধও এ সকল গান নয়, এটাও স্বীকার্য।

দুর্গম, বন্ধুর পথ বেয়ে কোথাও একটা পৌঁছতে হবেই কোনদিন, অভীষ্টকে ছুঁতেই হবে, গণজাগরণের মূল এই চেতনাকে এই গানগুলি আদরে জড়িয়ে রাখে। তবে এই একটি গান, আধুনিক গানই, একেবারে রাজনৈতিক ঘটনাকে সরাসরি তুলে ধরে। সে ঘটনা ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ। গানটি স্বল্পশ্রুত, গেয়েছিলেন সবিতা চৌধুরী-

আমি কী বলি, বলোনা সজনী-
কী দোষে হারাইলাম আমার ঘরবাড়ি?
পথে পথে ঘুইর‍্যা মরি, তাও জানিনা।
কিছু তো চাহিনি, আমার ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে
দুটি সোনার মত চাঁদ রইত যে বুক ভরে।
কারো কোন ক্ষতি, করেনি আমার পতি
তার সকাল বিকাল সাঁঝ যাইত লাঙল ধরে।
আজ কেন তাদের খুনে হইল যে লাল 'খুলনা'?

যে বিষয়টি একের পর এক সলিলের গানগুলি পড়তে পড়তে চোখে ভাসে, তা হল তাঁর দ্বিধা। সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর যে স্বপ্ন দেখেছিলেন দেশকে নিয়ে, যে কারণেই হোক তা ছেড়ে বেরিয়ে আসার কষ্ট পুষে রেখেছিলেন আজীবন! পূর্ণতা তা পায়নি সেভাবে, তাই অভিমান করেন সলিল পৃথিবীরই উপর! সব ছেড়েছুড়ে চলে যেতে গিয়ে ফের কোনওদিন আবার মায়ায় জড়িয়ে যান। দুটি গানের কথা এক্ষেত্রে বলা যায়। প্রথমটিতে, ওই অভিমান, ১৯৭৮ এ যার প্রকাশ, স্বকণ্ঠে-

এই রোকো পৃথিবীর গাড়িটা থামাও!
আমি নেমে যাব।
আমার টিকিট কাটা অনেক দূরের,
এ গাড়ি যাবে না, আমি অন্য গাড়ি নেব।

আমার স্বপ্ন ভরা 'লাগেজ' নামাও!
এই কুলি মহাকাল, কাঁধে তুলে নাও।
নিজেরই বৃত্তে ঘুরে মরে না যে গ্রহ-
সেই গ্রহ গাড়িটাতে, তুলে দিয়ে যাও।

আরেকটি গান, যাতে মায়া, প্রকাশ পায় এর ঠিক দু'বছরের মাথায়-

ধরণীর পথে পথে ধূলি হয়ে রয়ে যাব
এই কামনা, আর কিছু না।
আগামীর পায়ে পায়ে আমিও পৌঁছে যাব
সেই ঠিকানা, আর কিছু না...

জনম লগন ধরে
পতাকার মতো করে নিয়ে ইতিহাস,
যেতে যেতে ক্রমে ক্রমে
কখন গিয়েছি থেমে ভেঙে গেছে শ্বাস।
তুমি যদি কাল আসো নতুনেরে ভালোবাসো,
আঁধারেতে জ্বেলে নিও মোর বেদনা।

সলিলের পরিচালনায় ছায়াছবির গানগুলির কথাও এক্ষেত্রে মনে রাখবার। একটি সিনেমার নাম 'একদিন রাত্রে', প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৫৬ সালে। সেখানে লতার কণ্ঠে ছিল এই গান, যে গানে প্রিয়তমকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার সুমিষ্ট ছবিখানির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে মানুষের চৈতন্যের জাগরণকে-

জাগো-
অলস শয়ন ছাড়ো
সংকোচ সংহারো
নবারুণ রঙে রাঙো
প্রভাত আলোর ডমরু যে বাজে।

জাগ্‌রে জাগ্‌রে জাগ্ জাগ্ নবমন্ত্রে
প্রভাত সূর্যের গভীর মন্ত্রে
জাগ্‌রে জাগ্‌রে জাগ্‌রে-
জাগ্‌রে জাগ্‌রে জাগ্ জাগ্।

জাগো মোহন প্রীতম জাগো,
রজনী পোহায় গেল
নয়ন কমল মেলো।...

১৯৭২ সালের ছবি 'মর্জিনা আবদাল্লা'। সেই ছবিতে মান্না দের কণ্ঠে ছিল সলিলের এই কালজয়ী গান, যে গানে কাঠুরিয়াদের জীবনের ছবি, হতভাগ্যের ছবি, সেই ভাগ্যকে যুঝেই জীবন কাটাবার মেজাজ-

ও ভাইরে ভাই,
হে হে আয় রে আয়।
আয়রে কুড়ুল করাত নিয়ে,
পোড়া বরাত নিয়ে,
জঙ্গলে দঙ্গলে আয়রে-

আয় রে আয়, কাটি কাঠ, কাটি কাঠ,
কাটি কাঠ, কাট কাঠ!

জীবন দোলায় দু'দিন দোলোনা,
আশা নিরাশার ছলনায়।
কত স্বপন করেছ না বপন-
এখন শিকেয় তোলো না ভাবনা।

(আরে) বরাত ফরাত কিছু মানি না!
কী হবে কাল তা তো জানিনা!
শুধু দু'হাত, আছে কুড়ুল করাত-
যায় য'দিন য'রাত কেটে যাক না!

আবার বলা চলে ১৯৭৯ সালের 'শ্রীকান্তের উইল' ছবির এই গানটির কথা, যে গানে আমাদের চেনা-জানা ক্লেদাক্ত পৃথিবীটাকে এক স্বপ্নের দেশ বানিয়ে তোলার সাধ। ছোটদের সেই স্বপ্ন বুঝি কেউ দেখাচ্ছেন-

ছুক্‌ছুক্‌ ছুক্‌ছুক্‌ রেলগাড়ি চলে যায়।
বহুদূর বহুদূর দূরে দূরে চলো যাই।
ছুক্‌ছুক্‌ ছুক্‌ছুক্‌ ছুক্‌ ছুক্‌ ছুক্‌!

চলো, এমন কোনো দেশে যাই-
যে দেশে আপন পর বলে কিছু নাই!
নাই ভেদাভেদ যেথা সবে ভাই ভাই।
যে দেশে ক্ষুধার কোনো নেইকো বালাই। ...

ভাবো, এমন যদি হত-
ফুলে ফলে দুনিয়াটা ভরে যেত,
মুখে মুখে হাসি আর স্নেহভরা বুক,
তাহলে দারুন এক মজা হত।

ভুলে যাবার কথা নয়, ছোটদের গান নিয়ে সলিল চৌধুরীর ভাবনাচিন্তার কথাও। সাত ভাই চম্পার গল্পকথা কোন্‌ বাচ্চার অজানা? লতা মঙ্গেশকর যখন পারুল সেজে ফের সেই কাহিনি শোনাতে এলেন, সাত ভাইয়ের ঘুম না ভাঙা, সৎরানীর কাছে না ফেরার

ইচ্ছেপ্রকাশ, মনে মনে ভিনদেশী রাজকুমারের দেখা পাওয়া ইত্যাদি, তখনও ছোটদের কেন শুধু, বড়দেরও মন্দ লাগল না! কেবল এই কথাগুলি কিঞ্চিৎ ভাবিয়ে তুলল তাঁদের-

ও সাত ভাই চম্পা গো রাজার কুমার,
কোথায় পক্ষীরাজ ঘোড়া তোমার তলোয়ার?
আজও রাজার দেশে ঘোরে ছদ্মবেশে,
ডাইনি সর্বনাশী রাক্ষুসিরা আবার...

ছোটকালে অন্তরা গেয়েছিলেন "ও আয়রে ছুটে আয়, পুজোর গন্ধ এসেছে"। একেবারে ছড়ার গান যাকে বলে। শরতের রূপে আর পুজোর এসে পড়ায় উল্লসিত গানের বাচ্চা মেয়েটি মাকে বলে নতুন জামা, নতুন গয়নাগাটি পরিয়ে তাকে সাজিয়ে দিতে। ওদিকে মধ্যবিত্ত সুখী বাঙালি, যে পুজোর গানের ক্যাসেট কিনে পুজোর ছুটি কাটায়, মানুষ হিসেবে তার চৈতন্যকে জাগাতে সলিল গানটি শেষ করেন এই ভাবে-

কাঁদছ কেন আজ ময়না পাড়ার মেয়ে?
নতুন জামা ফ্রক পাওনি বুঝি চেয়ে?
আমার কাছে যা আছে সব তোমায় দেব দিয়ে
আজ হাসিখুশি মিথ্যে হবে তোমাকে বাদ দিয়ে।

আবার দেখা গেছে তীব্র ব্যঙ্গ, ছোটদের গানে, হাসির মোড়কে। যেমন এই একানড়ের গল্পে-

একানড়ে কানে কড়ে, তেঁতুল পাড়ে ছোঁড়ে ছোঁড়ে!
এক হাতে তার নুনের ভাঁড়, আর এক হাতে ছুরি!
কান কেটে নুন ঘষে বেড়ায় বাড়ি বাড়ি!

কানপুরেতে একানড়ের মস্ত বড় মোকান-
হরেকরকম কানের সেথা 'কানোহারি' দোকান!
কান পাতলা সেখানে যায় কিনতে মোটা কান!
আর কানে খাটো কিনে আনে লম্বা দেখে কান!
কানাঘুষো যা কিছু হয়, যত কানাকানি,
সবকিছু সেই একানড়ে করেছে আমদানি!

তখনও দেশ হয়নি স্বাধীন মন্ত্রী ছিলেন 'ডানকান'।
একবার কানপুরে এলেন কিনতে তাঁর বাঁ কান!
একানড়ে বললে দেখুন সময় দিতে হবে-

মন্ত্রীর কান, আনতে গেলে দিল্লি যেতে হবে!
এই না বলে একানড়ে দিল্লি দিল হাঁটা!
আর ছ'দিন পরে ফিরে এল চক্ষু ভাঁটা ভাঁটা!
বলল কেঁদে নিন ফিরিয়ে আপনার টাকাটা-
দিল্লি গিয়ে দেখি ওদের সবার দু'কান কাটা!

কোথাও আবার সোজাসুজিই যে প্রশ্ন রাখবার রেখেছেন সলিল, শিশুকণ্ঠেই-

ও মাগো মা, অন্য কিছু গল্প বলো
এক যে ছিল রাজা রানী অনেক হল।
বলো না কেন, ওই ওপাড়ার দাশুর ছেলে
জ্বরেতে ভুগে, না খেতে পেয়ে মারা গেল?

এই যে এত সব সারি সারি
বড় বড় বাড়ি আর এত গাড়ি
তবু কেন এত লোকে ফুটপাতে শোয়, তা বলোনা?

কেন সেদিন অঞ্জনাকে স্কুলের থেকে
মাইনে দিতে পারেনি বলে তাড়িয়ে দিল?...

কেন মাগো এত লোকে ভিক্ষে করে,
তা বলোনা?

বলোনা কেন দাদা মেজদা ঘরেতে বেকার?
ওরা তো দুজন লেখাপড়ায় ভালোই ছিল।

একসময় এই প্রশ্নগুলি কেবল মাকেই করে না শিশুটি, ছুঁড়ে দেয় যে কারোর দিকে, আর প্রশ্নগুলিও হয়ে ওঠে পরিণত, কিন্তু গানের সুরের চলন, ওঠা-নামা সবই রয়ে যায় ছেলেমানুষের বাচনের মতই! যেমন এই গানটি-

কেউ কি আমায় বলতে পারো
যুদ্ধ কেন হয়?
কেন লোকে যুদ্ধ করে?
আকাশ থেকে বোমা ফেলে
কামান দেগে গোলা মেরে
কেন অসহায় নারী আর
শিশু ওরা হত্যা করে?

কেউ কি বলতে পারো?
কেন হিরোসিমা হল?
কেন নাগাসাকি হল?
কার ভালো হল তা বলো
হাজার হাজার নারী শিশু হত্যা করে?

সলিল চৌধুরীর আধুনিক গানে (ছোটদের গানকে ধরেই) সমাজ, দেশকাল, মানুষের যন্ত্রণা, ঘাত-প্রতিঘাতের কথা মেলাই দস্তুর। ভাবতে হবে, মানুষটি একেবারে গণনাট্যের মঞ্চে দাঁড়িয়েই শুরু করেছেন তাঁর সংগীত জীবনের যাত্রা। সমসময়ের বা পূর্ববর্তী অন্যান্য গীতিকারদের গানেও 'গণসংগীত' বিন্দুমাত্র নয়, যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে, লক্ষ্যনীয় এইটাই বর্তমান অধ্যায়ে। জন্মসালের ক্রম অনুযায়ী সেই গীতিকারদের গানের কথা বলা দরকার আপাতত।

হীরেন বসু (১৯০৩-১৯৮৭) র এই গানটি পড়া যেতে পারে, দেশের কথাই সেখানে, কোন এক সুদিনেরও কথা-

আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও, জননী এসেছে দ্বারে!
সপ্ত-সিন্ধু কল্লোল-রোল বেজেছে সপ্ত তারে, জননী এসেছে দ্বারে।
সুর- সপ্তক তুলেছে তান- সপ্ত ঋষির গানে,
স্বপ্ত-স্বর্গে দুন্দুভি ঘোষে- সপ্ত গ্রহের টানে,
অন্তরে আজ সপ্ত-দলের নবজাগরণ সারে, জননী এসেছে দ্বারে।।

কিংবা ধরা যাক প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)র কথা। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ ও তারই সূত্র ধরে আই পি টি এ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি। তারপর যদিও সাহিত্যকেই মূল আশ্রয় করেন। তবে প্রায় একইরকম ভালোবাসতেন ছবির স্ক্রিপ্ট লিখতে, পরিচালনা করতে, ছবির গান লিখতেও। 'সেতু', 'হানাবাড়ি', 'ডাকিনীর চড়', 'চুপি চুপি আসে' –সিনেমাগুলির নাম স্মরণ করা যেতে পারে এক্ষেত্রে। এহেন প্রেমেন্দ্র ছবির জন্য ভুরি ভুরি প্রেমের গান লিখেছেন ঠিকই, পাশাপাশি লিখেছেন এই ধরণের জীবন উদযাপনের গানও, 'যোগাযোগ' (১৯৪৩) ছবির জন্য, যে গানটি গেয়েছিলেন রবীন মজুমদার-

এই জীবনের যত মধুর ভুলগুলি
ডালে ডালে ফোটায় কে আজ বুলিয়ে রঙিন অঙ্গুলি।।
রাখবে না সে কিছুই গোপন রাখবে না,
পাতার আড়াল দিয়ে কিছু ঢাকবে না,
মনের যত বন্ধ দুয়ার দরাজ করে দেয় খুলি।

অলি যত জুটবে, জানি, সবাই তারা রসিক নয়-
মধুর মর্ম কেউ বা জানে, কেউ বা শুধু হুলই বয়।
তবু হেথায় নেইকো কারো নেই মানা,
হেলায় ছড়াই সুবাসে তার ঠিকানা,
এ কূল গেছে আগেই যখন, যাক না এবার দু-কূলই!

'এ কূল গেছে আগেই যখন, যাক না এবার দু-কূলই' এই মেজাজ গণনাট্যই উপহার দিয়েছিল, স্বীকার না করে উপায় নেই।

তাঁর আর একটি দুটি গানের কথা বলা যাক। প্রথম গানটি কানন দেবী আর ফিরোজা বেগমের গলায় শুনতে পাওয়া যায়; আঁধার কেটে গিয়ে ভোর হবে সেই প্রত্যাশার গান-

হারা মরু নদী, শ্রান্ত দিনের পাখি,
নিবু নিবু দীপ, আর্ত-আতুর নহ একাকী।
সাগর কিনারে করুণার তীরে,
জীর্ণ তরীরা যেথা গিয়ে ভিড়ে,
সে মহামেলায় বেদনা তীর্থে আজিকে তোমাকে ডাকি।
ধরণী যাদের ধরিতে না চায়
দেবতা ফিরায় মুখ,
তাদের লাগিয়া মমতায় ভরা
শুধু মানুষেরই বুক,
এ তিমির শেষে আছে রে প্রভাত
সাদরে সবার ধরো শুধু হাত।
হৃদয় সুধার বিনিময়ে কিরে স্বর্গ মিলিবে নাকি।

আরেকটি গানে তো প্রতক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপ দেবার ইচ্ছেই স্পষ্ট-

অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখেছে আপন নাম,
চেন কি তাদের ভাই?
দুই তুরঙ্গ জীবন-মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম,
দুইয়েরই বল্গা নাই!

পৃথিবী বিশাল তারা জানায়েছে, আকাশের সীমা নাই,
ঘরের দেওয়াল তাই ফেটে চৌচির।
প্রভঞ্জনের বিবাগী মনের দোলা লেগে নাচে ভাই,
তাদের হৃদয়-সমুদ্র অস্থির!

বলি তবে ভাই, শোনো তবে আজ বলি,

অন্তরে আমি তাদেরই দলের দলী,
রক্তে আমার অমনি গতির নেশা,
নাশায় অগ্নি স্ফূরিছে যাহার, বিজলী ঠিকরে পড়ে
আমি শুনিয়াছি সেই হয়রাজের হ্রেষা!...

শৈলেন রায় (১৯০৫-১৯৬৩) ঐ সময়েরই আরেক খ্যাতনামা গীতিকার। "তোমারই পথপানে চাহি/ আমারই পাখি গান গায়/ শিশির নীরে অবগাহি/ কানন পথফুলে ছায়"ও লিখছিলেন তিনি, আবার 'বাবলা' (১৯৫১) ছবির জন্য লিখলেন গভীর জীবন দর্শনের এই গান-

জীবন পারাবারের মাঝি আলো অন্ধকারে-
প্রাণরসদের খেয়ায় তারি এপার ওপার দিচ্ছে পাড়ি,
জনম মরণ দুই তীরে সে ভিড়ায় তরীটারে।

উদার হাতে দান ক'রে সে উজাড় ক'রে নেবে,
এ কূলে তার দীপ জ্বলে ভাই, ও কূলে ভাই নেভে।
সে যে রাত্রি-দিনের জোয়ার ভাঁটায়, সূর্য ডোবায় তারা ফোটায়।
আবার নিভিয়ে শশী জ্বালছে রবি ঘুচিয়ে আঁধারে।

অজয় ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৪৩)র একটি আধুনিক গানের অভীষ্ট চিরকালের দুখীরা। অজয় বেশিদিন বাঁচেননি, গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা যে বছর, সেই বছরই তাঁর মৃত্যু। তবু দুঃখ দিয়েই দুঃখকে জয় করার মন্ত্র তিনি শিখেছিলেন, অস্থির দেশ কালের প্রভাব সেই শিক্ষায় নিশ্চিতভাবে ছিল, যা তাঁর সংগীতেও ছাপ ফেলেছে। প্রগুক্ত গানটি-

দুঃখে যাদের জীবন গড়া তাদের আবার দুঃখ কী রে?
হাসবি তোরা, বাঁচবি তোরা, মরণ যদি আসেই ঘিরে।

অন্ধকারের শিশু তোরা, আলোর তৃষায় মিছে ঘোরা,
আপন হৃদয় জ্বালিয়ে দিয়ে জ্বালবি সবার প্রদীপটিরে।
তোদের প্রাণে বন্দী হয়ে কাঁদে ভুখা ভগবান।
মুখে তবু খেলার বাঁশি যখন বুকে রয় পাষাণ।

হেলায় হেসে নিলি মরণ তাই তো মরণ পেলো লাজ।
ধূলির সাথে মিশে তোরা সোনার মত হলি আজ।

এবার যে রে প্রভাত আসে, রাতের আঁধার গেল টুটে,

ভোরের আলোর তিলক পরে বাহিরপানে আয় রে ছুটে।

দুঃখ তোদের জয়ের মালা দুঃখ হল মুকুট শিরে।
বাঁধন হল হাতের রাখী মুক্তি এল নয়ন নীরে।

কালো দিন ঘুচে গিয়ে আলোক আসবে- গণ আন্দোলনের এই মূল বিশ্বস্ততার জায়গাটা আধুনিক গানের শরীরে এঁকে দিয়েছেন অজয়-

ডুবল যদি একটি রবি, জ্বলল দিনের চিতা।
নিভল যদি একটি বাতি, জ্বালাও দীপান্বিতা।

বিমলচন্দ্র ঘোষ (১৯১০-১৯৬৮) এর কথা মনে পড়বে প্রসঙ্গত। বিমলচন্দ্র ছিলেন কবি। আজীবন বামপন্থায় বিশ্বাসী। প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলা চলচ্চিত্রজগতে গীতিকার হিসেবে তাঁর অনুপ্রবেশ। সেই অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়েরই পরিচালনায় 'শাপমোচন'(১৯৫৫) ছবির জন্য লিখলেন তিনি দুটি গান, যেগুলিতে সুর দিলেন হেমন্ত, গাইলেনও হেমন্ত এবং যেগুলি দারুন জনপ্রিয়তা পেল। খেয়াল করবার, প্রথম গানে যে তান্ডবের বর্ণনা, তা মিলে যায় গণঅভ্যুত্থানের চিত্রের সঙ্গে-

ঝড় উঠেছে বাউল-বাতাস আজকে হল সাথী
সাতমহলা স্বপ্নপুরীর নিবল হাজার বাতি।
রুদ্রবীণার ঝঙ্কারেতে ক্ষুব্ধ জীবন উঠল মেতে,
সকল আশার রঙিন নেশা ঘুচল রাতারাতি।
আকাশ জুড়ে দীর্ঘশ্বাসের মাতন হল শুরু,
সুরের স্বপন ভাঙল শুনে মেঘের গুরুগুরু।
উড়ছে ভুলের ঘূর্ণী হাওয়া, সকল চাওয়া, সকল পাওয়া
শুকনো পাতার মর্মরেতে করছে মাতামাতি।

আর দ্বিতীয় গানটিতে তো রূপকের আশ্রয়ে নিষ্ঠুর বন্ধনের কথা, যা বিশেষ একশ্রেণির জন্যই চিরদিন বরাদ্দ-

শোনো বন্ধু শোনো, প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা,
ইঁটের পাঁজরে লোহার খাঁচায় দারুণ মর্মব্যথা।
এখানে আকাশ নেই
এখানে বাতাস নেই
এখানে অন্ধগলির নরকে মুক্তির আকুলতা।

জীবনের ফুল মুকুলেই ঝরে সুকঠিন ফুটপাতে
অতি সঞ্চয়ী ক্রূর দানবের উদ্ধত পদাঘাতে।

এখানে শান্তি নেই
এখানে স্বস্তি নেই
প্রাসাদ নগরী যেন বিলাসের নিদারুন রসিকতা।

"আমি বনফুল গো", বা "লাজে রাঙা হল কনে বউ গো" র মত অজস্র জনপ্রিয় গান যাঁর কলমে তৈরি, সেই প্রণব রায় (১৯১১-১৯৭৫) গান শিখতেন কাজী নজরুলের কাছে। নজরুলেরই পাল্লায় পড়ে তাঁর গান লিখতে আসা। তার আগে অবধি লিখতেন কবিতা। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখক ছিলেন। বিতর্কিত রাজনৈতিক লেখা লিখে জেলও খাটেন। গানের দুনিয়ায় পাকাপাকিভাবে এসে পড়ার পর সব ধরণের গান লিখেছেন তিনি- ভাটিয়ালী, স্বদেশী, ভক্তিমূলক, প্রেমের গান। কমল দাশগুপ্তের সুরে, প্রণব রায়ের কথায় সুধীরা সেনগুপ্ত ও যূথিকা রায়ের দ্বৈত কণ্ঠে 'জাগ্রত ভারতবর্ষ', 'বন্দিনী মেয়ে জাগো' গানদুটি দেশপ্রেমমূলক এবং পরাধীন দেশে গানগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এই গানগুলির কথা মাথায় রেখেই বলা চলে, দেশ, সময়, দেশের মানুষ, তাদের জন্য লড়াই –এগুলি কোনদিনও গুরুত্ব হারায়নি প্রণবের কাছে। হতে পারে এই গানটি সিনেমার (সিনেমার নাম 'মন্দির'), কাজেই নির্দিষ্ট পরিস্থিতির জন্য লেখা, তবু তাঁকেই কিন্তু দেওয়া হয়েছিল দায়িত্ব, প্রেমাবেশ ত্যাগ করে এক পথিক চলেছে এগিয়ে, মহৎ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে, তারই মানসিক দোলাচল গানে তুলে ধরার জন্য-

গহন রাতের একলা পথিক, ওরে চল, শুধু চল।
ডাক দিল, ওরে ডাক দিল ঝড়ের আকাশ-
মেলে দে, মেলে দে পাতা চঞ্চল। ওরে চল, শুধু চল।
মিনতির মালাখানি দোলে, এ আঁধারে যেতে হবে চলে।
দেখিবার নাহি হে সময়, কার চোখে নামিল বাদল।
পিছনে ডাকিছে ভালোবাসা, হায়, শুনিবার নাহি অবসর।
তোর লাগি নহে গৃহকোণ, নহে তোর মিলনবাসর।
তোর আছে কন্টক মালা, তোর লাগি দীপ সে যে জ্বালা
নয়নে যেন রেখে চায়, নয়নে, তোর নয়নে, নয়নে আসে যদি জল।

ওদিকে 'নায়িকার ভূমিকায়' ছবিটির এই গানে দেখি, ঝড়ঝঞ্জা নয়, নতুন এক ভোর এসেছে, তারই বন্দনা করেন প্রণব-

নতুন সূর্য, আলো দাও, আলো দাও।
স্বার্থের লোভে মিথ্যারে যেন করিনা কো আশ্রয়।
সত্যের পথ হোক না দুঃখময়।

দুঃখ থাক, মিথ্যা যাক, আলো দেখাক।
সত্যের পথ মঙ্গল পথ, তাই শেখাও।
নতুন সূর্য, আলো দাও, আলো দাও।

মানুষেরে যেন বঞ্চনা করে নিজেরে করি না হীন।
অন্যায় যেন হার মানে চিরদিন।
অন্ধ রাত করো প্রভাত, আলো দেখাও।
মর্মে আমার শুভ্র প্রাণের ফুল ফোটাও।
নতুন সূর্য আলো দাও, আলো দাও।
আঁধার মনের দিগন্তে আজ আলো দেখাও।

মোহিনী চৌধুরীর (১৯২০-১৯৮৭) র গানও প্রঙ্গক্রমে উল্লেখ করার মতো। মনে পড়বে সেই গানটির কথা যে গানকে আশ্রয় করে সলিল লিখেছিলেন "ওগো প্রিয় মোর, খোলো বাহুডোর, পৃথিবী তোমারে যে চায়"। একজন কট্টর বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষ যখন প্রেমের গান লিখতে এলেন, শান্তি, স্বস্তি কিছুই পেলেন না, এক আশ্চর্য তাড়না, দেশের-দশের কাজ করবার, তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল-

পৃথিবী আমারে চায়, রেখো না বেঁধে আমায়-
খুলে দাও প্রিয়া, খুলে দাও বাহুডোর।
প্রণয় তোমার মিছে নয় মিছে নয়
ভালোবাসি তাই মনে জাগে এত ভয়।
চাঁদ ডুবে যাবে ফুল ঝরে যাবে মধুরাতি হবে ভোর।
সবার মনের দীপালি জ্বালাতে যে দীপ আপনি জ্বলে
কেন আর তারে ঢেকে রাখো বলো তোমার আঁচলতলে?
শোন নাকি ঐ আজ দিকে দিকে হায়
কত বধূ কাঁদে, কাঁদে কত অসহায়
পথ ছেড়ে দাও, নয় সাথে চলো, মুছে নাও আঁখিলোর।

শ্যামল গুপ্ত (১৯২২-২০১০) কে একটি সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞাসা করেছিলেন স্বপন সোম "আপনি যখন চারের দশকে গান লিখতে শুরু করেন, সে সময় সংস্কৃতিজগতে গণনাট্য সংঘ একটা বিশেষ জায়গা নিয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী প্রমুখ সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষের কথা তুলে আনছিলেন গানে, এসব আপনার মনে কেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল?"[১০] শ্যামল গুপ্ত উত্তর করেছিলেন-

গণনাট্য সংঘের গান তখন শুনেছিলাম। ভালোও লেগেছিল। তবে খুব যে আকর্ষণ বোধ করেছিলাম তা বলব না। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর সঙ্গে আমার ভালোই জানাশোনা ছিল। কিছুদিন

ওয়েলিংটনের মোড়ে প্রগতি লেখক শিল্পীসংঘে যাতায়াত করেছি। তবে গণনাট্য-র সঙ্গে যুক্ত হইনি। বা এমনও হতে পারে গণনাট্য সংঘের আমাকে দরকার পড়েনি। একটা কথা এই সূত্রে খুব পরিষ্কার করে বলা দরকার যে আমি কোনো মেসেজ দিতে হবে এই ভেবে গান লিখিনি। মনের আনন্দে গান লিখেছি। চেষ্টা করেছি যাতে গানের ভাষা-ভাব চটুল না হয়। একটা কাব্য থাকে। গভীরতা থাকে। তাছাড়া খুবই সচেতন থেকেছি যাতে অন্য কারো প্রভাব আমার গানে না পড়ে। আমি মনেপ্রাণে চাইতাম আমার গান যেন অন্য কারুর মত না হয়।[১১]

তারপরেও বেশ কিছু গান শ্যামল লিখেছেন যেগুলিতে ওই, মানুষেরই কথা। যেমন-

অন্তবিহীন নহে তো অন্ধকার,
কঠিন আঘাতে ভাঙিবে বন্ধদ্বার।
সাধনসূর্য রাঙায়ে পূর্বাচলে
জীবন জাগায়ে মুক্তির শতদলে
বিশ্বে মিলাবে অতুল গন্ধভার।
প্রলয় ভেরীতে ক'রে গেছে আহ্বান
জীবনে বেজেছে মানবেরই জয়গান।
সংশয় ভরে মিথ্যা থেকো না সরি
বৃথা সংকোচে আপনারে হীন করি,
মিলিত শক্তি ঘুচাবে দ্বন্দ্ব তার।

এই গানটির মতই জগন্ময় মিত্রের সুর করা আর গাওয়া তাঁর আরেকটি গানে রয়েছে এক মহাপ্রাণের স্তুতি, যার স্পর্শে আঁধার কেটে যাবে, আশা করেন তিনি-

প্রণাম তোমায় হে নির্ভয় প্রাণ,
যাত্রার পথে জীবন করেছ দান।
চির রাত্রির তীরে, তুমি জাগায়েছ পৃথিবীরে
অন্ধযুগের আঁধারে দিয়েছ আলোকেরই সন্ধান।

আরেকটি গানও অসামান্য। সুর দিয়েছিলেন তাতে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আরো অনেকে, একত্রে। সংগ্রামকে স্বাগত জানানোর গান এটি-

জনশক্তির প্রাণবন্যায় নবযৌবন ওরে জাগল।
জরাজীর্ণের জড় সুপ্তির সুখতৃপ্তির ঘুম ভাঙল।
এল শৌর্যের ত্যাগধর্মের এল কর্মের পথে আহ্বান।
জয় শান্তির জয় ঐক্যের দিল হুঙ্কার কোটি সন্তান।
গিরিকন্দর সে প্রতিজ্ঞায় পূতরক্তের রঙে রাঙল।
ভাঙে দুর্বার স্রোতে স্বার্থের যত ভঙ্গুর বাধাবন্ধন।
দেশগৌরব দেশরক্ষায় পেল মৃত্যুর অভিনন্দন।

এ যে মিথ্যার সাথে সত্যের এ যে ধ্বংসের সাথে সৃষ্টির
গণতন্ত্রের মানবত্বের মহাসংগ্রাম এ শতাব্দীর
অমারাত্রির মুখ উজ্জ্বল করে সূর্যের আলো লাগল।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (১৯২৫-১৯৮৬) বোধ হয় ওই সময়ের সবচেয়ে খ্যাতনামা গীতিকার। একের পর এক হিট গান বেরিয়েছে তাঁর হাত দিয়ে। একদিকে লিখেছেন "আমি যামিনী তুমি শশী হে"র মত প্রেমের গান, অন্যদিকে "শিং নেই তবু নাম তার সিংহ"র মত মজার গান, আরেকদিকে 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ছবির জন্য সেই গানটিও, যে গান অহিংসার বাণী প্রচার করে-

তোমার ভুবনে মাগো এত পাপ,
এ কি অভিশাপ? নাই প্রতিকার?
মিথ্যারই জয় আজ, সত্যের নাই তাই অধিকার।
কোথায় অযোধ্যা, কোথা সেই রাম, কোথায় হারালো বনধাম?
এ কী হল, এ কী হল, পশু আজ মানুষেরই নাম।
সাবিত্রী, সীতার দেশে, দাও দেখা তুমি এসে
শেষ করে দাও এই অনাচার।
তোমার কঠিন হাতে বজ্র কি নাই?
হিংসার করো অবসান।
তোমার এ পৃথিবীতে যারা অসহায়,
তুমি মা তাদের করো ত্রাণ।
চরণতীর্থে তব এবার শরণ লব
দুর্গম এই পথ হব পার।

'নীল আকাশের নীচে' ছবির জন্য আরেকটা গান লিখেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন; সমাহিত, শান্ত সুরে গেয়েছিলেন তা হেমন্ত, সেখানেও সেই দুঃখী মানুষেরই কথা-

নিবিড় আঁধার নেমে আসে, ছায়াঘন কালো রাত-
কলরব, কোলাহল থেমে যায়,
নিশীথপ্রহরী জাগে।
তুমি দেখেছ কি?

সেই বেদনার ইতিহাস শুনেছ কি?
দেখেছ কি মানুষের অশ্রু?
শিশিরে শিশিরে ঝরে-
তুমি দেখেছ কি?

অসীম আকাশ, তারই নীচে চেয়ে দেখো ঘুমায় মানুষ
জাগে শুধু কত ব্যথা, হাহাকার-
ছোট ছোট মানুষের ছোট ছোট আশা,
কে রাখে খবর তার?
তুমি দেখেছ কি?
আর শুনেছ কি মানুষের কান্না?
বাতাসে বাতাসে বাজে-
তুমি শুনেছ কি?

'ইন্দ্রানী' ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৫৮ সালে। সেই ছবির একটি দৃশ্য ছিল শ্রমিকদের পাথর ভাঙার। দৃশ্যোপযোগী একটি গান লিখেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন-

ভাঙ্‌রে ভাঙ্‌রে ভাঙ্ ভাঙ্ রে, পাথর ভাঙ্।
ভাঙ্ কপাট, ভাঙ্ বিষাদ, ভাঙ্ রে ভয়, দিক সওয়ার।
ভাঙ্ আঁধার অন্তরে, আন ডেকে আলোর জোয়ার।
শোন মুখে ঘুমভাঙা, ওই রাঙা, নতুন দিন।
সত্যিরে চিনব আজ, সাধব ভাই যা কঠিন।
ভাঙ্‌রে কঠোর হাতে বজ্র হানি, ভাঙ্।
ভাঙ্‌রে অলস সুখ ঘুমের গ্লানি, ভাঙ্।
ভাঙ্ রে।

প্রসঙ্গত সম্পূর্ণ অন্য মেজাজের একটি গানের কথা উল্লেখ করা যায়, আপাদমস্তক যে গানে ব্যঙ্গ আর রসিকতার আড়াল; ভিতরে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কিছু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রশ্ন রাখা। ১৯৬৯ সালে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনি নিয়ে 'চিত্রসাথী' র পরিচালনায় রিলিজ করেছিল 'শেষ থেকে শুরু' ছবিটি। সেই ছবির জন্যই গৌরীপ্রসন্ন লিখেছিলেন-

বলো হরি, হরিবোল! বলো হরি, হরিবোল!
মরে গিয়ে তরে গেছে,
তরে গিয়ে বেঁচে গেছে,
যমদূত হেঁচে গেছে,
নেচে নেচে খাট তোল, বাজাও খোল!

রোল, রোল, রক অ্যান্ড রোল!
বোল, বোল, হরিবোল!
বল হরি, হরি বোল!
বল হরি, হরি বোল!

ঐ চোখে আর দুনিয়াটাকে দেখতে হবে না।
ওকে সোজা পথে চলতে গিয়ে বেঁকতে হবে না।
মালিকরা তো ওর কপালে হাতুড়ি আর ঠুকবে না।
রাজনীতিতে ফাটলে গলা ওর কানে আর ঢুকবে না।
ও যে বেঁচে থেকে মরে ছিল, মরে গিয়ে বেঁচে গেল।
যমদূত হেঁচে গেল!
নেচে নেচে কাঁধে তোল, বাজাও খোল!

সুধীন দাশগুপ্ত (১৯২৯-১৯৮২) একাধারে ছিলেন গীতিকার ও সুরকার। নিজের কথায়, সুরে সুবীর সেনকে দিয়ে গাইয়েছিলেন এই গানটি, যা বাণী আর আঙ্গিক- দুই দিক দিয়েই 'গণসংগীত' এর খুব কাছাকাছি মনে হয়-

ওই উজ্জ্বল দিন, ডাকে স্বপ্ন রঙিন
ছুটে আয়রে লগন বয়ে যায়রে মিলনবীন
ওই তো তুলেছে তান- শোনো আহ্বান।

তারি সুরে সুরে বাজে গুরু গুরু।
হোক গানে গানে পথচলা শুরু।
আজ অন্তরে অন্তরে প্রান্তরে প্রান্তরে
কণ্ঠে ছড়াব এই গান।

আয় আয়রে ছুটে, আয় বাঁধন টুটে
আনি মুক্ত আলোর বন্যা।
আয় সুপ্তি ভাঙাই, আয় শান্তি জাগাই
এই শ্যামলী ধরণী হবে ধন্যা।

ওই আকাশে বাতাসে দোলা লাগল।
আজ জীবনে জোয়ার বুঝি জাগল।
নব উচ্ছল উচ্ছ্বাসে, উদ্দাম উল্লাসে
ছন্দে জাগাব এই গান।

মান্না দের কণ্ঠে সুধীন দাশগুপ্তের আরেকটি গানের 'কথা'ও উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে আচমকা এক আলোর কথা আছে, যে আলো দুর্নিবার, যে আলো গতির প্রতীক, যে আলো শুভ-

এক ঝাঁক পাখিদের মত কিছু রোদ্দুর,
বাধা ভেঙে জানলার শার্সি সমুদ্দুর,

এক ঝাঁক পাখিদের মত কিছু রোদ্দুর
এল আঁধারের শত্তুর।

বন্ধ ঘরের এই কোল ছাড়িয়ে,
রাস্তায় দিল যারা পা বাড়িয়ে,
সেই অন্ধকারের মন সঙ্গে নিয়ে যে সূর্যের সাথে ওরা এল কদ্দূর?

পায়ে পায়ে সন্ধ্যার ক্লান্তি নিয়ে,
যারা যায় ফিরে ঘরে শহরে নগরে,
পায় কি মনে সূর্যের গতিবেগ
অস্তরাগের ছোঁয়া অন্তরে?..

সুবীর সেনের কণ্ঠে পরিচিত অন্য একটি গান পড়ে দেখা যেতে পারে এইবার, সুধীন দাশগুপ্তেরই লেখা-

স্বর্ণঝরা সূর্যরঙে আকাশ যে ওই রাঙল রে।
ঝর্ণাধারা বন্যা যেন পাষাণহৃদয় ভাঙল রে।
চম্পা জাগো জাগো রে,
কেন গো পারুল ডাকো রে?

গান বেঁধে নিই, সুর সেধে নিই,
সূর্য ওঠার লগনে।
দুঃখের দিন করব বিলীন,
মুক্ত আলোর প্লাবনে।
চম্পা জাগো ভাই,
পারুল ডাকে তাই।

আজকে ধরা স্বপ্নে ভরা,
বাজলো রে বীণ ঝঙ্কারে।
আয়রে তোরা ক্লান্তিহরা,
জয় করে নে শঙ্কারে।

চম্পা জাগো জাগো রে,
এলো যে ঢেউ সাগরে।

আনব জোয়ার খুলব দুয়ার,
রইব না আর বন্ধনে।
ফিরব প্রাণের ছন্দে গানের,
এই জীবনের সন্ধানে।

চম্পা জাগো ভাই,
সময় যে আর নাই।

পারুল বোনের ডাকে চম্পার ঘুম ভাঙাকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করে আসলে জাগরণের সময় যে এসেছে, সে কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে এই গানে।

পরেশ ধর (১৯১৮-২০০২) এর গান অধিকাংশই গণচেতনার গান। গণনাট্য সংঘের নর্থ স্কোয়াডের লিডার ছিলেন তিনি। 'ভোটরঙ্গ', 'দুর্ভিক্ষের পাঁচালি' পরেশ ধরের এই বিখ্যাত গণসংগীতগুলি পরিবেশনের রীতি ছিল নেচে নেচে। বহু গানের ভিতর ওঁর দুটি গানের কথা উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না এক্ষেত্রে। দুটিই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে পরিচিত-

ফুলের মতো ফুটল ভোর,
ভাঙল মাঝির ঘুমের ঘোর,
যাত্রা শুরু হবে এবার এল যে সময়।
ঝিকিমিকি জল নদী টলমল জোয়ার বয় রে বয়।
ঐ হাঁকছে মাঝি চোখে যাদের ঘুম,
ঐ চতুর্দিকে প্রতিধ্বনির ধুম,
আয়, ফেলে দে মনের যত পিছু টানার সতর্ক সংশয়।

এই গানটিকে যদি গণসংগীতও বলি, (কারণ কথা আর সুর তা ই প্রমাণ করে), দ্বিতীয় গানটি একেবারেই তা নয়। গ্রামের ছবি আঁকতে আঁকতে তা আচমকাই রাজনৈতিক হয়ে ওঠে-

শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি
একটু হাওয়া নাই জল যে আয়না তাই,
ঝিম ধরেছে ঝিম ধরেছে গাছের পাতায়
পাল গুটিয়ে থমকে গেছে ছোট্ট তরীটি।
উড়ছিল ঘুড়ি গাছটি ডিঙিয়ে
বন্ধ বাতাসে পড়ল ঝিমিয়ে
ক্লান্ত সুরে ডাকছে দূরে ঘুঘু পাখিটি।
দুষ্টু ছেলেটা গরমে ঘামে,

নদীর ঘাটে জলেতে নামে।
জমছে কালো মেঘ, অন্ধকার ঘনায়,
তাই দেখে মাঝি আকাশে তাকায়
ক্রুদ্ধ ঝড়ে উঠবে নড়ে স্তব্ধ প্রকৃতি।

'জমছে কালো মেঘ, অন্ধকার ঘনায়' থেকে গানের শেষ –এই তিনটি পঙক্তিতে সেই দৃঢ়, প্রখর উচ্চারণ যা যুগবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে যায়, বা বলা ভালো, হয়তো সে প্রসঙ্গকে মাথায় রেখেই বলা।

গীতিকার সত্যজিৎ রায়ের (১৯২১-১৯৯২) কথা রাখতেই হয় এই আলোচনায়। ১৯৬৯ সালে মুক্তি পায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে, সত্যজিতের পরিচালনায় 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন'। সে ছবিতে সুন্ডি অধিগ্রহণ করতে চায় সুন্ডিরাজেরই আপন ভাই, হাল্লা দেশের রাজা। সুন্ডির রাজার কাছে সে বার্তা এসে পৌঁছলে রাজা ভয়ে মূর্ছা যান; কারণ তার সৈন্য নেই, সামন্ত নেই, হাতি নেই, ঘোড়া নেই, অস্ত্র-শস্ত্র কিচ্ছু নেই। এদিকে হাল্লারাজ যখন সেনা-সামন্ত নিয়ে এগিয়ে আসে সুন্ডির দিকে, গুপী-বাঘা সেইসব আধপেটা খেয়ে থাকা হাল্লার সৈন্যদের সামনে ভূতের রাজার বর খাটিয়ে হাজির করে রাশি রাশি খাবার! ব্যাস, অমনি যুদ্ধের কথা ভুলে যায় সৈন্যরা। হামলে পড়ে খাবারের ওপর। এরকম পরিস্থিতিতে ছবিতে রয়েছে গুপীর গলায় একটি গান, খিদে আর যুদ্ধের সম্পর্ক সে গানে প্রতিষ্ঠিত, মোটের ওপর যুদ্ধবিরোধী সে গান, লিখেছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎ-

ওরে বাবা দেখো চেয়ে কত সেনা চলেছে সমরে!
হাজারে হাজারে হাতিয়ার বুঝি কাটাকুটি করে!
আহারে আহারে আহারে!
পেটে খেলে পিঠে সয়, এ তো কভু মিছে নয়।
সেনা দেখে লাগে ভয়, লাগে ভয়।
আধপেটা খেয়ে বুঝি মরে, মরে।
যত ব্যাটা চলেছে সমরে।

ও রে হাল্লারাজার সেনা,
তোরা যুদ্ধ করে করবি কী তা বল?
মিথ্যে অস্ত্রশস্ত্র ধরে প্রাণটা কেন যায় বেঘোরে?
রাজ্যে রাজ্যে পরস্পরে দ্বন্দ্বে অমঙ্গল।
তোরা যুদ্ধ করে করবি কী তা বল?

রাজা করেন তম্বিতম্বা, মন্ত্রী মশাই কীসে কম বা?

(ওরে) প্রজা পেয়ে অষ্টরম্ভা হল হীনবল।
তোরা যুদ্ধ করে করবি কী তা বল?

আয় আয় আয়রে আয়, আয়রে আয়, আয়রে আয়-
আয়রে বোঝাই হাঁড়ি হাঁড়ি, মন্ডা মিঠাই কাড়ি কাড়ি আয়।
মিহিদানা, পুলিপিঠে, জিভেগজা মিঠে মিঠে,
আছে যত সেরা মিষ্টি, আছে যত,
এলো বৃষ্টি, এলো বৃষ্টি, এলো বৃষ্টি, ওরে...

১৯৮০ তে মুক্তি পায় 'হীরক রাজার দেশে'। সেই ছবির একটি গানে দেশের প্রজাকে শোষণ করে ফুলেফেঁপে ওঠা অর্থপিশাচ হীরকরাজের উদ্দেশে ধিক্কার মুক্তকণ্ঠে, শ্রেণিবৈষম্যের প্রতিবাদে লেখা এ যাবৎকালের বহু গণসংগীতের মতই-

রাজা দুষ্ট, রাজা মন্দ,
রাজা ধূর্ত, রাজা ভণ্ড,
রাজা নীচ, রাজা ক্রূর, রাজা খল।
রাজা অনাচারের সীমা ছেড়ে,
অভাগারে ভাতে মেরে,
আনে দেশে ঘোর অমঙ্গল।

রাজা রাখল তাদের চেপে,
যারা উঠলে পরে খেপে,
রাজার আসনখানা করবে টলমল।
রাজা ঠিক কিনা ঠিক কিনা, তুই বল।

রাজার শক্ত হাতে শিক্ষা পেলে শাস্তি হবে ঠিক।
রাজা ধিক ধিক ধিক।

এইবারে রাজা শোনো,
জেনো নিস্তার নেই কোনও।
এসেছে তোমার যম,
তুমি রাজা অক্ষম,
মরণের দিন তুমি গোনো।

এই ছায়াছবিরই একটি দৃশ্যে চরণ দাস নামের এক গায়ককে পেয়াদা ধরে, হুকুম ক'রে তার গান গাওয়া নিষেধ করে দেয়। কেন যে নিষেধ- তা জানতে চরণ হাজির হয় সটান রাজার কাছে। রাজা শুনতে চায় চরণের গান, দোতারা বাজিয়ে সে শুরু করে-

কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়!
ও ভাই রে, ও ভাই
কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়!
আমি যেইদিকেতে চাই,
দেখে অবাক বনে যাই।
আমি অর্থ কোনো খুঁজে নাহি পাই রে।
ও ভাই, অর্থ কোনো খুঁজে নাহি পাই রে।
ভাই রে ভাই রে।

এই অবধি শুনে রাজা আর তার পারিষদ প্রশংসা করে, গানের ভাষা খাসা- ইত্যাদি বলে যেই, ততক্ষণে গানের অন্তরায় পৌঁছে যান চরণ-

দেখো ভালো জনে রইল ভাঙা ঘরে।
মন্দ যে সে সিংহাসনে চড়ে।
ও ভাই, সোনার ফসল ফলায় যে তার
দুইবেলা জোটে না আহার।
হীরার খনির মজুর হয়ে কানাকড়ি নাই।
ও ভাই, হীরার খনির মজুর হয়ে কানাকড়ি নাই।
ভাই রে, ভাই রে।
কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়!

ঠিক এই অংশে পৌঁছে গানটি রাজনৈতিক হয়ে ওঠে।

সিনেমার গান থেকে বেরিয়ে বেসিক অ্যালবামের গানের দিকে নজর ফেরালে খেয়াল করা যাবে জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১৭)কে। সুমনের অনুপ্রেরণা তিনি বহুলাংশে, সুমন বারবার তা স্বীকার করেছেন।

জটিলেশ্বরের বিশেষ যে গানটির কথা সুমন বিভিন্ন আলোচনায় উল্লেখ করেছেন, সে গান ভারি আশ্চর্য! কথায়-সুরে মিললে তার, অদ্ভুত ব্যঞ্জনা তৈরি হয়। পরিপার্শ্বের সঙ্গে মিলিয়ে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন, দুঃখী সময়ের ছবি তার পরতে পরতে-

রাত্রি সে তো স্বভাবে মলিন,তাকে সয়ে থাকা যায়।
ভোরের পথের দিকে চেয়ে থাকা যায়।
সে ভোর অন্ধ হল, কী হবে এখন?

তার যে কথা ছিল আলো দেবার!
ও কি সূর্য নাকি, স্বপনের চিতা?
ও কি পাখির কূজন নাকি, হাহাকার?
এ কোন্ সকাল, রাতের চেয়েও অন্ধকার?

'অদ্ভুত আঁধার এক' ঘনিয়ে উঠেছে যেন চারপাশে, যাকে পাত্তা না দিয়ে চলার সামর্থ নেই কারো, ফাগুন মাস, মলয়া বাতাসের রোমান্টিক ইমেজও যে খান খান করে দিচ্ছে, মেঘের আনাগোনাও আর মনে হচ্ছে না স্বস্তিদায়ক, সে কথাই জানিয়ে লিখেছিলেন জটিলেশ্বর-

খর বৈশাখে, প্রথম যে দিন,
মেঘের মিছিলে ওই আকাশ রঙিন,
তৃষিত হৃদয়ে বাজে আনন্দ বীণ,
আমি শুনি, ঝড়ের পূর্বাভাস।

সুমন যখন ইন্টারভিউ নিতে যাচ্ছেন জটিলবাবুর বাড়ি, ছেলেমানুষের মত তাঁকে শোনানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন তিনি সদ্য লেখা গান। সে গানেও আঁধার পেরিয়ে আলোয় পৌঁছনর আশা-

এখানে বড় অন্ধকার, আলোয় নিয়ে চলো।
তোমায় বলছি, তোমায়, যে দীপে আগুন জ্বালো।

পাশাপাশি আরেকটি জনপ্রিয় গানে খেয়াল করি, সাম্যের আশায় রয়েছেন জটিলেশ্বর, চারপাশে, সর্বক্ষেত্রে বিভাজন, বিভেদ হতাশ করছে তাঁকে-

কোথাও আলো সূর্য সমান, কোথা চির অমানিশা।
কোথা অনন্ত ধারা বহমান, কোথাও মরুর তৃষা।
সে আলো, সে জল সমানুপাতে, ছড়িয়ে দেওয়া যেত যদি, কত ভালো হত!

তাঁর অন্য একটি গানে স্বপ্নের সেই দেশেরই সন্ধান-

অনেক শহর গ্রাম ছাড়িয়ে অনেক দূর সে গ্রাম
কেউ জানো কি তার নাম?
সে গ্রামের আজব খবর কানে আসে,
সেখানের মানুষ নাকি মানুষ পেলে ভালোবাসে!

সে গ্রামে নেই তো কারো ঘরের অভাব,
কেননা ঘরে ডাকাই তাদের স্বভাব।
সেখানে কথায় কথায় হয়না কোনো কথার নিলাম।

সে গ্রামের ছবি আহা- জীবন ভরে,
দেব না মুছে যেতে হঠাৎ ঝড়ে,
যেখানেই থাকো তুমি বন্ধু,
তোমায় এ কথা দিলাম।

আবার আরেকটি গানে দেখতে পাই, কেবল আশা করার চেয়ে, কার্যক্ষেত্রে নেমে প'ড়ে কিছু করে দেখানোর কথাই বলছেন তিনি-

ও মাঝিরে, পার করে দে,বলব না আর।
তোর খেয়াল খুশির দোল দুলব না আর।
যা হয় তা হোক, আমি এবার
দেবো সাঁতার, এপার ওপার।

সত্তরের দশকে আধুনিক বাংলা গানকে এক নতুন চেহারায় হাজির করে 'মহীনের ঘোড়াগুলি'। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকসংগীতের সুর, তাল ব্যবহার ক'রে; সঙ্গে জ্যাজ, রক প্রভৃতি পাশ্চাত্য সংগীতের ফর্মের আমদানি করে বাংলা গানকে সম্পূর্ণ নতুন মোড়কে মুড়ে ফেলেন গৌতম চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জন ঘোষাল, এব্রাহাম মজুমদার, তাপস দাস, তপেশ বন্দ্যোপাধ্যায়েরা। একইসঙ্গে বাঙালী ও আন্তর্জাতিক মনন ও চেতনার অধিকারী এঁরা ১৯৭৫ সাল থেকে শুরু করেন পথচলা, সমবেতভাবে। সত্তরের টালমাটাল রাজনৈতিক আবহাওয়ার ভিতর, সময়কে উপেক্ষা না করেও মূলত গতানুগতিক সমাজের সাংস্কৃতিক গড্ডলিকাপ্রবাহের বিরুদ্ধে সঘোষিত বিদ্রোহকে উপস্থিত করেন এঁরা। আধুনিক বাংলা গানে এখানেই তাঁদের গুরুত্ব।

গাথানি রেকর্ডস থেকে ১৯৭৭ সালে মুক্তি পায় 'মহীনের ঘোড়াগুলি'র প্রথম অ্যালবাম 'সংবিগ্ন পাখিকূল ও কলকাতা বিষয়ক'। এই অ্যালবামের 'হায় ভালোবাসি' গানটির পরতে পরতে রোম্যান্টিসিজম, আবার আছে শ্রমজীবী মানুষের কথাও। যে অনুভূতিগুলি আমাদের মনকে আর্দ্র করে, যেমন প্রেম, স্নেহ, করুণা, দুঃখ এগুলির সাথে সাথে যা কিছু অপছন্দের অনুভব, বা রাগ, বিরক্তির, গ্লানির- এসবকেও প্রয়োজনে নরম করে বলেন এঁরা এঁদের গানে। কীভাবে বলছেন, সেটা তাঁদের দলের নিজস্বতা, কিন্তু বলছেন, এটাই নজর করবার। 'হায় ভালোবাসি'র সঞ্চারী অংশ ও তারপরের অংশ-

ভালো লাগে ডিঙি নৌকায় চড়ে ভাসতে,
প্রজাপতি, বুনো হাঁস ভালো লাগে দেখতে,
জানালার কোণে বসে উদাসী বিকেল দেখে,

ভালোবাসি একমনে কবিতা পড়তে।

যখন দেখি ওরা কাজ করে গ্রামে বন্দরে,
শুধুই ফসল ফলায় ঘাম ঝরায় মাঠে প্রান্তরে,
তখন ভালো লাগেনা লাগেনা কোন কিছু।
সুদিন কাছে এসো, ভালোবাসি একসাথে আজ সবকিছু।

১৯৭৯ এ প্রকাশিত তৃতীয় অ্যালবাম (দৃশ্যমান মহীনের ঘোড়াগুলি) এর একটি গানে কী যে চায় মহীনের ঘোড়ারা, সেই ইচ্ছের প্রকাশ ঘটেছে সরাসরি। যেন গোটা সমাজটাই খুঁজছে নতুন ভোর, বা, গান খুঁজছে নতুন সুর-

এই সুরে সুরে বহু দূরে চলে যাব, চলে যাব।
পথ দেখাব, পথ দেখাব।
আসলে, এসো না এই নতুন পুরে।
আর ভাবনা নেই।
আপনাতেই সুর ঝরাব, সুর ঝরাব,
সব সরাব, সব সরাব।
সবকিছু যা আছে পুরনোতেই।
ফিরব না পিছনে, আর অন্ধকারে,
শব্দহীন শব্দের এই আঁধারে।

এরপর 'মহীনের ঘোড়াগুলি' দীর্ঘ এক বিরতি নেয়। সদস্যরা দেশে বিদেশে নানা পেশায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ১৯৯৫ সালে 'আবার বছর কুড়ি পরে' নামের একটি অ্যালবাম মারফত এদের প্রত্যাবর্তন। সেই অ্যালবামের জন্য একটি গান লিখেছিলেন গৌতম চট্টোপাধ্যায়, যে গান গেয়েছিলেন অন্তরা চৌধুরী-

এলো কি এ অসময়?
মনে শুধু জাগে ভয়।
ফিরে আর পাব কি কখনো?
তুমি আছো তবু সংশয়!
গেয়ে গান যাব যে তখনো।
এলোমেলো হাওয়া কেন বয়?
আকাশে চাঁদ জেগে রয়।
তবু, বলো বলো বলো কেন এমনও হয়?

ইতিমধ্যে ১৯৯২ এ বেরিয়েছে সুমন চট্টোপাধ্যায়ের (জন্ম- ১৯৪৯) প্রথম অ্যালবাম, 'তোমাকে চাই'। আর তারই সূত্র ধরে বাংলা আধুনিক গান পৌঁছে গেছে আর এক নতুন

বাঁকে। আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচনা সুমনের গানে গণসংগীত কী প্রভাব ফেলেছে, বা সুমনের বেশ কিছু গান যদি আধুনিক কালের গণসংগীতই হয়, তাহলে তা কোন্‌গুলি ও কেন- এই দিয়েই শেষ করা হবে। কারণ মূলত, এই গবেষণায় যে ক'টি দশককে বাছা হয়েছে, বিশ শতকের শেষ দশক তার অন্তর্ভুক্ত নয়; যদিও সুমনের আবির্ভাব ওই নব্বই-এ ই, তবু সুমনের গানে দেশ, কাল, সমাজের প্রভাব এত বেশি যে, তাঁকে বাদ দেওয়া এক্ষত্রে অসম্ভব। 'তোমাকে চাই' অ্যালবামেই ছিল এই গান, ছিল এই পঙক্তিগুলি-

টাকাতেই চলছে সবার পাকস্থলী।
কেনা আর বেচা নিয়ে গেরস্থালি।
নি-পা-গা-রে রবীন্দ্রনাথ তেরেকেটে!
বাজারের খাবার ওই ঢুকছে পেটে।
প্রতিবাদী কণ্ঠগুলোও টাকার ব্যাপার
প্রতিবাদ করতে গেলেও খাবার দাবার।
সে তুমি শ্রমিক কিংবা তাধিন ধি না,
পেটে চাই খাবার নয়তো দিন চলে না, দিন চলে না।

একই অ্যালবামের আরেকটি গানে আছে সেই ছেলের কথা, খাবারের তাড়নায় যে শৈশবের খুশি ভুলে গেছে, ভুলতে বাধ্য হয়েছে-

পেটকাটি চাঁদিয়াল মোমবাতি বগ্‌গা,
আকাশে ঘুড়ির ঝাঁক মাটিতে অবজ্ঞা।
বয়স বারো কি তেরো, বড়োজোর চোদ্দ
রিক্সা চালাতে শিখে নিয়েছে সে সদ্য।
ছেলেটার মন নেই প্যাডেলে বা চাক্কায়।
ওই তো লেগেছে প্যাঁচ চাঁদিয়াল বগ্‌গায়-
শান দেওয়া মাঞ্জায় বগ্‌গা ভোকাট্টা,
ছেলেটা চেঁচিয়ে ওঠে : এই নিয়ে আটটা।
সওয়ারবাবুটি ভাবে, দেরি হয়ে যাচ্ছে-
বিচ্ছু ছোঁড়াটা বড়ো আস্তে চালাচ্ছে।
এই ছোঁড়া মলো যা, আটটা তো তোর কী?
সওয়ারবাবুটি দে রেগেমেগে হুমকি।
বাবুর খ্যাঁকানি শুনে সম্বিত ফিরে পায়,
ছেলেটা যে করে হোক রিকশা চালিয়ে যায়।
এ কিশোর পারবে কি এই বোঝা টানতে?
এই বাবু কোনদিন পারবে কি জানতে?

যে ছেলেটা প্রাণপণে রিক্সা চালাচ্ছে,
মুক্তির ঘুড়ি তাকে খবর পাঠাচ্ছে।

এ গানের শেষ চরণটিকে অরুণকুমার বসু 'তৎকালীন গণসংগীতের শেষ চরণের একটা ক্লিষ্ট অনুকরণ"[১২] বলেন যখন, তখন তা ঠিক বা বেঠিক এই তর্কে না গিয়ে এ কথা খেয়াল করা যেতে পারে, সুমনের গানের সঙ্গে গণসংগীতের সম্পর্ক নির্ধারণ আলটপকা কোনও বিষয় নয়, সমালোচকেরা এদিকটা আগেও ভেবেছেন, কেবল গান ধরে ধরে নিবিড় অনুসন্ধান হয়তো করা হয়ে ওঠেনি।

'তোমাকে চাই' অ্যালবামেই ছিল 'তিনতালের গান'। ছিল সাম্যের কথা, ঐক্যের কথা, আবার ভয় দেখানোও ছিল!

আমি থাকি তুই থাক, সকলেই বেঁচে থাক,
এরা থাক, ওরা থাক, বেঁচে থাক, থাক না।
আমি খাই, তুই খা, তারা খাক, তোরা খা,
সকলেই করে খাক, সক্কলে খাক না।
কেউ যদি বেশি খাও, খাওয়ার হিসেব নাও-
কেননা অনেক লোক ভালো করে খায় না!
খাওয়া, না-খাওয়ার খেলা, যদি চলে সারাবেলা,
হঠাৎ কি ঘটে যায়, কিচ্ছু বলা যায় না!

সুমনের গান শুনতে বসে আবিষ্কার করা যায়, সম্পূর্ণ আলাদা প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে, তাঁর গানের কোনো অন্তরা, কোনো সঞ্চারী বা কোনো আভোগ আচমকাই হয়ে ওঠে প্রতিবাদী, কিংবা সাধারণ খেটে খাওয়া লোকের জন্য মরমী বার্তা শোনা যায় সেখানে। যেমন ধরা যাক, ১৯৭৯ সালে, ওয়াশিংটনে বসে লেখা একটি গানে একা মানুষের কথা বলছিলেন সুমন। বলছিলেন-

কত জানলার কাছে একলা মানুষ।
একলা পৃথিবী তার যেন মহাকাল।
কত জানলায় আসে একার সকাল।

ব্যক্তিগত দুঃখের সাথেই মিলিয়ে শুনতে শুনতে হঠাৎ শোনা যায় সুমন গাইছেন-

কত জানলার কাছে রাখা পোস্টার-
কত কথা, কত খিদে, কত চিৎকার।
কত জানলার কাছে কাতারে কাতার
মানুষ জমেছে, দাবি গরাদ ভাঙার।
ভাঙে যেন জানলার গরাদ সবার।

যে জানলা নিঃসঙ্গ মানুষের নিঃসঙ্গতার অভিঘাত টের পাচ্ছিল এতক্ষণ, মুহূর্তে সেই জানলাকে এক রূঢ় বন্দীশালার প্রতীকে প্রতীকায়িত করেন সুমন।

আবার কখনো গোটা গান জুড়ে থাকে সুমনের রাজনৈতিক বক্তব্য-

তোমার আমার স্বাধীনতা,
রক্তের মত লাল স্বাধীনতা,
তোমার আমার স্বাধীনতা,
আকাশের মত নীল স্বাধীনতা।
সাতচল্লিশ নয় স্বাধীনতা।
সাতচল্লিশ আনেনি, দেয়নি স্বাধীনতা।
কৈশোর থেকে শুধু শুনে গেছি তোমার নাম।
ইতিহাসের পাতায় পড়ে গেছি তোমার নাম।
তুমি নাম থেকে গেছ স্বাধীনতা!
তোমার নাম নিয়ে করে খেল কিছু লোক।
তুমি নেই বলে খেল না অনেক বেশি লোক!
খেতে পাওয়ার নাম স্বাধীনতা।
কাজ পাওয়ার নাম স্বাধীনতা।
পড়তে পারার নাম স্বাধীনতা।
ভাবতে শেখার নাম স্বাধীনতা।

"সুমনের গান আসলে গণনাট্যের গান- সলিল-হেমাঙ্গ-ভূপেন-গৌতম-প্রতুলের গানেরই সার্থক উত্তরসাধনা"[১৩] সত্রাজিৎ গোস্বামীর এই মতটি 'স্বাধীনতা' গানটি শোনার প্রসঙ্গে যথার্থ মনে হয় খুব। তবে কেন বাংলা আধুনিক গান হিসেবেই তাকে দেখা হল- সে কথায় ফিরে আসা হবে আলোচনার শেষে।

কোনো কোনো গানে দেশ জুড়ে চলা মিথ্যাচার, দুর্নীতির সমালোচনা করার পাশাপাশি আত্মসমালোচনাও করতে দেখা যায় তাঁকে, যেমন-

নবাব নবাবী করে, নেতা নেতাগিরি
ট্রেনে ট্রেনে গান গায় বাউল ভিখিরি...
বক্তা বকুনি মারে, ভাত মারে কারা?
রাজনীতি দিয়ে ঢাকা তাদের চেহারা।
কেউ ছোঁড়ে হাতবোমা, কেউ বা প্রণামী
গান ছুঁড়ে ছুঁড়ে করি টাকার গোলামী!

'বাঁশুরিয়া'র গল্প বলা যাক এইবার। কোন এক 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' সকাল থেকে তেড়ে বৃষ্টি। সুমনের বাড়ির পাশে বিহারী শ্রমিকদের বাস, তাঁদেরই কেউ মাঝেসাঝে বাঁশি

বাজান, সুমন আগে শুনেছেন। আজ এই বৃষ্টির দিনে সুমন শুনলেন কেউ বলছেন ‘এখন সকাল ন'টা। বৃষ্টি পড়ছে। আজ আমি কাজে যাব না।' পরমুহূর্তেই তাঁর কানে এল এক দেহাতি সুর কে তুলেছে বাঁশিতে। সুমনের মনে হয়, কাজে না যাবার কথা যিনি বললেন কিছু আগে, আর এই বাঁশিওয়ালা একই ব্যক্তি। চমকে উঠে, খানিকক্ষণের ভিতর লিখে ফেলেন তিনি এই কথাগুলি, শেষে ঐ, আত্মসমালোচনা-

ফাঁক পেলে বাঁশি বাজাও ফেলে আসা ঘরের ডাকে।
দেশে গিয়ে এমন সুরে হয়তো ডাকো কলকাতাকে।
ফিরে এসে উদোম খাটো গায়ে গতরে ব্যস্ত হাতে।
মজুরিতে ভাগ বসাচ্ছে কারা তোমার কলকাতাতে?
তাদেরই গাইয়ে আমি সাজানো জলসায়!
গেঁয়ো সুর ভেসে বেড়ায় শহুরে হাওয়ায়।

নিপীড়িতের প্রতি সংবেদনশীলতার শিক্ষা সুমন ছোটদেরও দেন একটি গানে, একটু ব্যঙ্গাত্মক উপায়ে, যেখানে খোকা-খুকুদের জন্য এক 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে-

এঁকো না কখনো চেনা রাস্তায়,
কাগজ কুড়িয়ে ভরে বস্তায়,
যে ছেলেটা রোজ একা চলে যায়,
তার মুখ কদাকার।

সেও কি কোথাও বসে ছবি আঁকে?
কারা রঙ আর খাতা দেয় তাকে?
এসব প্রশ্ন কখনো কোরো না,
বোবা কালা হয়ে থাকো!

শিক্ষিত নাগরিক কেউ কোন প্রশ্ন করে না আজকাল, নিজের ক্ষতি কল্পনা করে কুলুপ এঁটে থাকে মুখে, চোখের সামনে ঘটে যায় অন্যায়, হাজার হাজার অসঙ্গতি নজরে আসে, তবু! কারণ মেরুদন্ডহীনের মত আত্মসমর্পণ করেছে তারা রাষ্ট্রের কাছে! কারণ, মগজে তাদের রাষ্ট্রের জারি করা কারফিউ! সুমন লেখেন-

মগজে কারফিউ, নিষেধ বেরোনো।
ভাবনা নিয়ে একা রাস্তা পেরোনো।
ভাবতে বেরোলে, রাস্তা পেরোলে,
পেয়াদা ধরবে, বেঘোরে মরবে। ...
ফারাক রেখে দিও কথায় কর্মে

এটাই লেখা আছে যুগের ধর্মে। ...

ন্যায়-নীতি, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের এই কালে চিরাচরিত রোমান্টিক ইমেজধারী চাঁদের সঙ্গে মিল খুঁজে পান সুমন 'কাস্তে'র, সেই সূত্রে শোনান মুক্তির কথা যেন-

বেখাপ্পা যুগে আবছায়া রাত,
জাপটে ধরছে অদৃশ্য হাত।
নীরবে দেখছে: চাঁদের কাস্তে,
ধারালো হচ্ছে আস্তে আস্তে।

তবে গানই পারবে রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক- এই সকল দৈন্য ঘোচাতে, এ স্বপ্ন চোখে নিয়ে লিখে ফেলেন তিনি-

যাও গান, আণবিক বোমাটাকে ধরো!
যদি পারো পোখরানে চাষবাস করো!
যাও গান, বিজ্ঞানীদের গিয়ে বলো-
ধ্বংসের তত্ত্বটা ভুলে যাই চলো। ...

যাও গান, ছেলে-মেয়েদের হাত ধরো।
মন্ত্রণা দাও, বলো বিদ্রোহ করো।
যাও গান, বলে দাও, আরো একবার-
পৃথিবীটা পাখি, গাছ, মানুষ সবার।

যাও গান, সকলের কাছে গিয়ে বলো-
পৃথিবীটাকে খুব ভালোবাসি চলো।
যাও গান, দেখি কারা এই গান গায়?
বোমা নয়, সব্বাই যেন খেতে পায়।

যাও গান, দাবী করো গণজাগরণ।
তুমি নিষ্ফল হলে আমার মরণ!

পরমাণু বোমা মানেই যুদ্ধ। সেই যুদ্ধকে আটকাতে হবে যেনতেনপ্রকারে- সমাজসচেতন গীতিকার হিসেবে যুদ্ধবিরোধী গান তাই সুমনের কাছ থেকে পাওয়ারই কথা। দেখে ভালো লাগে, মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্বই এই যুদ্ধ আটকাতে পারে- এমন চমৎকার কথা ভাবতে পারেন তিনি-

একটা থালায় চারটে রুটি, একটু আচার, একটু ডাল।
একই থালায় দুজন খাবে, যুদ্ধ হয়তো আসছে কাল!

একটা মাঠে দু'জন সেপাই দেশবিভাগের সীমান্তে।
দু'জন আছে দুইদিকে আর বন্ধু তারা অজান্তে!
তারা এ দেশ ভাগ করেনি, দেয়নি কোথাও খড়ির দাগ।
নেতারা সব ঝগড়া করেন, জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ।
ঝগড়া থাকে আড়াল করে লাভের মাটি লাভের গুড়।
সীমান্তে দুই দেশের সেপাই দেশপ্রেমের দিনমজুর।
দুই কাঁধে দুই বন্দুক আর বুলেট বেশি খাবার কম!
রাজনীতিতে হিসেব কষে এদের নেতা, ওদের যম।
যমের বাড়ি কাছেই আছে, অনেক দূরে নিজের ঘর।
দেশপ্রেমের নজির হল এই চিতা আর ওই কবর!
খিদের কিন্তু সীমান্ত নেই, নেই চিতা, নেই কবরটাও
যুদ্ধটাকে চিতায় তোলো, যুদ্ধটাকেই কবর দাও।

শহরে ঘটে যাওয়া এক গণধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদ করে যে গান লিখেছিলেন সুমন, তার কয়েকটি লাইনে স্পষ্টই বলে দেওয়া আছে, কেন এ গান আলাদা-

চিৎকার করে বলতে চাইছি যদিও গাইছি গান,
ধর্ষণগীতি গেয়ে যাই পাছে পুরুষরা ভুলে যান।

কত রকমের গান যেন আছে ওমুক তমুক গীতি,
বেদনা বিধুর, পরশ মধুর রিমিক গানের স্মৃতি।
স্মৃতিবিজড়িত সেই সন্ধ্যায় স্টেশনের কোনো ঘরে,
তিনটি পুরুষ একটি মেয়েকে শুধু ধর্ষণ করে।

বিপুল আলোড়ন তোলা একের পর এক রাজনৈতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে শুধু বিচ্ছিন্ন একটা-দুটো গান নয়, সুমন তৈরি করে ফেলেছেন একেকটি সম্পূর্ণ অ্যালবাম । যেমন ২০০৭ এ প্রকাশিত 'নন্দীগ্রাম', ২০০৮ এ 'রিজওয়ানুরের বৃত্ত', ২০১০ এ 'ছত্রধরের গান', বা একই বছরে 'লালমোহনের লাশ' প্রভৃতি। আমাদের আলোচনায় এইসব অ্যালবামের গানগুলি আর উল্লেখ করা গেল না, কারণ এইগুলি আমাদের গবেষণায় নির্ধারিত সময়ের বহু পরবর্তী। পাশাপাশি আরেকটি যে কথা বলবার, গবেষণার সীমিত সময়সীমার বাইরে বেরিয়েও যদি নব্বইয়ের দশকে সুমনের গানে গণসংগীতের প্রভাব খোঁজা বিশেষ দরকারি বলে মনে হয়ে থাকে আমাদের, তবে সমসাময়িক অঞ্জন দত্ত, মৌসুমী ভৌমিক বা কিছু পরের নচিকেতা, কাজী কামাল নাসের- প্রমুখের গানেও সে প্রবণতা খুঁজে দেখা উচিত ছিল! খোঁজা হয়নি, কারণ, এ তথ্য সকলেরই জানা, সুমন এঁদের প্রত্যেককে প্রভাবিত করেছেন। সুমনের অনুবর্তী হিসেবে, 'জীবনমুখী' গানের ধারক ও বাহক হিসেবেই দেখা

হল এঁদের। আর এঁদের ভাবনাচিন্তার উৎসমুখ হিসেবে ও এক নতুন প্রবণতার সঙ্গে আলাপ করানোর উদ্দেশ্যে সুমনের লেখনীর কিছু বিশেষত্ব তুলে ধরা হল এই অধ্যায়ে।

এইখানে, কিছু আগের তুলে রাখা প্রশ্নটা ফিরে দেখা যায় যদি, মনে পড়বে সুমনের আত্মকথা অনুযায়ী 'গণসংগীত' এর প্রতি ওঁর অনীহার কথা, আমাদের এ লেখায় যা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। একেবারে শুরুর দিকে লেখা 'স্বাধীনতা', বা এই সেদিনের 'খুন হওয়া গান' কিংবা ধর্ষণের প্রতিবাদ করে লেখা 'মেয়েটা'- এগুলি বা এগুলির মত আরো অজস্র সময়কে ধারণ করে থাকা গান আমাদের বিচারে গণসংগীত হলেও, 'আধুনিক বাংলা গান' এর অধ্যায়েই তাদের রাখা হল, কারণ আর কিছুই না, সুমন নিজে তাই চান। ২৮ শে অক্টোবর, ১৯৯২ এ, আনন্দবাজার পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন-

> লক্ষ করে থাকবেন, আমার গানের কথার একটা প্রতিবাদী চরিত্র আছে। কিন্তু গণসংগীতের সঙ্গে যে ধরণের অনুষঙ্গ জড়িয়ে থাকে তার থেকে আমার গান আলাদা।[১৪]

সম্ভবত সেই অনুষঙ্গের ব্যাখ্যা ওঁর নিজের কথাতেই এরকম-

> দেখুন, গণসংগীত যদি জনগণের সংগীত হত, তবে আমার গানকেও গণসংগীত বললে কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু গণসংগীত এখন আর জনগণের সংগীত নেই। তা হয়ে উঠেছে পার্টির জয়গানের মাধ্যম। শুধু তাই নয়, গণসংগীত ব্যাপারটাই এখন এত ক্লিশে হয়ে গেছে যে, অতি বড় বামপন্থীও দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে শুনতে চান না।[১৫]

সূত্রনির্দেশ :

১. কবীর সুমন, *হয়ে ওঠা গান*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮১
২. ঐ, পৃ. ৭৯
৩. ঐ, পৃ. ৯৯
৪. ঐ, পৃ. ১০৩

৫. বিশ্বাস হেমাঙ্গ, "সত্তর দশক ও গণসংগীত", আচার্য অনিল(সম্পা.), *সত্তর দশক-খণ্ড দুই* অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৬৬
৬. সেনগুপ্ত দিলীপ, "গণনাট্য আন্দোলন ও বাংলা গানের ধারা-একটি সমীক্ষা", ঘোষ ডঃ প্রদীপ কুমার (সম্পা.), *সংগীত আকাদেমি পত্রিকা ৭*, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২৩০
৭. বসু অরুণকুমার, *সলিল থেকে সুমন এবং তারপর*, সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৭৩
৮. চক্রবর্তী সুধীর, *বাংলা গানের আলোকপর্ব*, ইন্দিরা, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৬
৯. চৌধুরী সলিল, "আত্মজীবনী", গুপ্ত সমীরকুমার (সম্পা.) *রচনাবলী সলিল চৌধুরী*, মিলেমিশে, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৯৫-১৯৬
১০. সোম স্বপন, "শ্যামল গুপ্তর সঙ্গে মুখোমুখি", সোম স্বপন (সম্পা.), *বেঁধেছি আমার স্মরণবীণ*, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৪০৯, পৃ. ২৮৯
১১. ঐ, পৃ. ২৮৯
১২. বসু অরুণকুমার, *সলিল থেকে সুমন এবং তারপর*, সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৯
১৩. গোস্বামী সত্রাজিৎ, *বানভাসি সময়ের গান*, পরম্পরা, কলকাতা, ২০১০, পৃ ৩৭
১৪. বসু অরুণকুমার, *সলিল থেকে সুমন এবং তারপর*, সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৭৮
১৫. ঐ, পৃ. ৭৮

উপসংহার

কেন ১৯৪০ থেকে ১৯৯০- এই পাঁচটি দশককে নির্বাচন করা হয়েছে আমাদের গবেষণার কাজে, তার ব্যাখ্যা আবশ্যক। চল্লিশের দশকে বাংলা গণসংগীতের আবির্ভাব, যদিও '৪৩ এ গণনাট্যের প্রতিষ্ঠা, তবু তার আগেই গণনাট্যকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড নিশ্চিতভাবে শুরু হয়েছিল। গোটা চল্লিশের দশক জুড়ে গ্রামে, শহরে, মফঃস্বলে কত যে গান লেখা হয়েছে, তার হিসেব দেওয়া সেদিনও অসম্ভব ছিল, আজও তাই। বিষয়ের অভাব কোন গীতিকারের সেদিন হয়নি। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিই সে অভাব রাখেনি। যাঁরা গান লিখে নাম করেছেন সেই সময়, তাঁদের প্রত্যেকের আত্মকথা পড়লে জানা যায়, একের পর এক গান এসেছে তখন তাঁদের কলমে, নেশাগ্রস্তের মত তাঁরা শুধু লিখে গেছেন। স্মৃতিকথায় হেমাঙ্গ বিশ্বাস জানিয়েছিলেন- তখন দুটো শব্দ চালু হয়ে গিয়েছিল, link-up আর way out! যা কিছু লেখা হোক না কেন , তাকে link করতে হত জাপানি ফ্যাসিবাদের সঙ্গে, আর যা ই লেখা হোক, দুর্ভিক্ষের হাত থেকে মুক্তির উপায়, way out হিসেবে বলতে হত উৎপাদন বাড়ানোর কথা!

এরই মাঝে এল '৪৭, দেশভাগের মত রূঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। এ এক অর্থে শান্তি, স্বস্তি, উল্লাসের খবর হওয়া সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারীরা একে প্রকৃত স্বাধীনতা বলে মেনে নিতে পারেননি। যেভাবে ইংরেজ সরকার বুর্জোয়াদের হাতে ভারতের শাসন ক্ষমতা তুলে দিল, সেটা জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল বলেই মনে হয়েছে তাঁদের। শুরু হল তীব্র আন্দোলন, হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখলেন 'আজাদি হয়নি আজও তোর, নব বন্ধন শৃঙ্খল ডোর'। স্বাধীনতা-উত্তরকালে শাসকগোষ্ঠী তাদের অস্তিত্ব নিয়ে অস্বস্তির মুখে পড়ায় কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হল। তবু গান লেখায় ভাঁটা পড়েনি সেরকম। উল্টে প্রতিবাদ, প্রতিরোধের জবাব দিতে দিতে নিজের রাস্তা খুঁজে নিল গান।

পঞ্চাশের দশকে মধ্যবিত্ত জনগণের কানে গণসংগীত পৌঁছে দেওয়া গেল। কারণ গণনাট্য সংঘের তৎকালীন গীতিকার, সুরকারেরা অনেকেই বিদেশী রেকর্ড কোম্পানির ডাকে সাড়া দিলেন, নিজেদের গান শিল্পীদের দিয়ে রেকর্ড করালেন। অনেকাংশেই গানগুলি যেন আধুনিক গানের নতুন মোড়কে মোড়া গণসংগীত! 'পথে এবার নামো সাথী', বা 'রানার' কিংবা 'গাঁয়ের বধূ'- গণনাট্যের মঞ্চে হাজারবার গাওয়া এই গানগুলি প্রচার করা হতে লাগল 'আধুনিক গান' নামে। সলিল নিজে এই সময়েই পাকাপাকিভাবে বোম্বে চলে গেলেন। এই দশকের শেষের দিক থেকে আন্তর্জাতিকভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনে কিছু পরিবর্তন দেখা গেল। 'স্বপ্নের দেশ' সোভিয়েত রাশিয়ার নানা আচরণ ঘিরে বিতর্ক শুরু হওয়ায় কমিউনিস্টরা সারা পৃথিবীজুড়েই খানিক দিগভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তার প্রভাব নিশ্চিতভাবে পড়ল এদেশেও। এ দেশের গানেও।

ষাটের দশকে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে তৎকালীন শাসকচক্র দেশের বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ধ্বংস ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করার অভিপ্রায়ে নির্মম অত্যাচারের পথ নিয়ে, নেতৃবৃন্দকে কারান্তরালে পাঠালেন। এইসময় অনেক শিল্পী অত্যাচারের ভয়ে ভীত হয়ে শাসকবর্গের সঙ্গে হাত মেলান, এমনকি গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রভৃতির বিরুদ্ধে অপপ্রচারও শুরু করেন! চল্লিশের দশকের সাংস্কৃতিক আন্দোলন সূত্রে উঠে আসা অনেক প্রতিভাবান গীতিকারই সাংগঠনিক বৃত্তের বাইরে অল্প অল্প করে নিজের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার জমি খুঁজতে শুরু করেন। ষাটের মাঝামাঝি সময়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে বিভাজন ঘটে, সেই সূত্রে গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরাও বিছিন্ন হয়ে পড়েন। ফলে গণসঙ্গীতও ঝিমিয়ে পড়ে। একেবারে শীতঘুমে চলে যায় বললেও ভুল বলা হয় না!

ষাটের দশকের শেষের দিকে নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানকে ঘিরে গণসংগীতের পালে হাওয়া লাগে ফের। এইসময় গানে গানে আক্রমণ করা হয় রাশিয়াকে, যে রাশিয়া একদিন গণআন্দোলনকারীদের কাছে শ্রেণিহীন সমাজের মডেল ছিল; নকশালপন্থীরা আক্রমণ হানেন সাবেক কমিউনিস্ট পার্টির উপরই। মাও এর আদর্শে আদর্শায়িত গণসংগীতকারেরা তাঁদের ভাবনায় উজ্জ্বল করে তোলেন চীনের ভূমিকা। গীতিকারদের ভিতর সাধন দাশগুপ্ত,

শ্যামসুন্দর বসু, বিপুল চক্রবর্তী, শুভঙ্কর মুখার্জী, শুকরা ওঁরাও, কালু সিং কয়েকটি বিশেষ নাম এই সময়ের। এছাড়া বহুজন গান লিখেছেন নকশালবাড়ির ঘটনার মধ্যে উপস্থিত থেকে, বা বাইরে থেকেও। এরপর নকশালবাড়ি ইস্যু রাজনীতির মঞ্চে ফিকে হতে শুরু করে, গণসংগীতও হালে পানি পায়না তেমন।

ইতিমধ্যে '৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচনে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি জয়লাভ করে এবং সরকার গঠন করে। রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে নতুন সুর বাজে। বিগত দশকগুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানান সরকারবিরোধী গণআন্দোলন ও আন্দোলনকারীরা মাথার ওপর ছাদ পায় যেন। '৭৮ এ স্তালিনের জন্মশতবার্ষিকী মহা আড়ম্বরে পালন করে সরকার। সরকারের সভাসমিতিতে গাইবার জন্য যথেষ্ট গান রচিত হতে থাকে। এছাড়াও নানা ঘটনার প্রতিক্রিয়াও অনেক গানের জন্ম দেয়। আশির দশকের চিত্রও মোটের ওপর এইরকমই। আশির দশকেই, গণনাট্যসংঘের গানগুলি নতুন অ্যারেঞ্জমেন্টে, নতুন শিল্পীদের দিয়ে নতুন করে রেকর্ড করান সলিল চৌধুরী। এভাবেই চলতে চলতে একটা সময় দেখা যায়, গণসংগীত এর কথা সরকারেরই বিপক্ষে চলে যাচ্ছে। তখন থেকে ফের গণসংগীত উলটোপথে হাঁটা শুরু করে। মোটামুটি নব্বই এর দশকের গোড়া থেকে এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়। এরপর থেকে আজ অবধি আর কখনোই সেভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি গণসংগীত। আজ তা বলে কোন গানই লেখা হয় না, যা সময়ের কথা বলে, তা নয়; কিন্তু সেগুলির ক্ষমতা সীমিত, বিপুল জনসংখ্যার সামনে তা পৌঁছতেও পারে না, তাঁদের রক্ত গরম করে দেওয়া তো দূর! বলা যেতে পারে, ওই নব্বইয়েরই গোড়াতে গণসংগীত বাংলা গানকে দিয়ে যায় নতুন এক ফর্ম, যার নাম 'জীবনমুখী গান'।

বাংলা গণসংগীতের এই যাত্রাপথের শুরু ও শেষ আমাদের বিচারে মোটাদাগে '৪০ ও '৯০। সেইকারণেই এই সময়পর্বের নির্ধারণ এই গবেষণাকার্যে।

পশ্চিমবঙ্গে সরকার-বিরোধী মত প্রকাশ করা গেল না, শুধু এই কারণেই গণসংগীত চিরকালের মত হারিয়ে গেল, এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। আলোচনার একেবারে শেষ পর্বে রইল আরো কিছু কারণের অনুসন্ধান-

- ৭০ এ আসে দূরদর্শন। তারই হাত ধরে আসে অপসংস্কৃতির বাঁধভাঙা জোয়ার। সুস্থ সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম বন্ধ হয়ে যায় একপ্রকার। অশ্লীল গান, উদ্দাম নাচ টিভি-র পর্দায় সর্বক্ষণ মনোরঞ্জন করতে থাকে সবার। এই অসুস্থ প্রবণতা শিল্পের কোনো মাধ্যমকে ছেড়ে কথা বলেনি। বছরের পর বছর ধরে পেশাদার নাট্যমঞ্চে, সংগীতে তা থাবা বসিয়েছে। বিশেষ করে গণসংগীত যেখানে মাঠে-ঘাটে গাইবার গান সেখানে এই টিভি-র মত আড়ালপ্রিয় গণমাধ্যমগুলি এত সস্তার বিনোদনকে প্রশ্রয় দিয়েছে যে মানুষ তাতেই ভাসিয়ে দিয়েছে নিজেকে, সংস্কৃতির অন্য দিকগুলির দিকে ফিরেও তাকায়নি!
- চল্লিশের পর শক্তিশালী গণসংগীতকার উঠেও আসেননি তেমন কেউ, যিনি লেখনী দিয়েই কোনো আন্দোলনকে সংস্কৃতিগতভাবে নেতৃত্ব দিতে পারেন। স্বীকার করতেই হয়, অন্যান্য সকল গানের মতই গণসংগীতও পারফর্মিং আর্ট, তাই পরিবেশনা বা উপস্থাপনার ওপরও তার ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভরশীল। গণসংগীত যাঁরা লিখতে পারেন তাঁদের যে রাজনৈতিক চেতনা, যে বোধ আর গণসংগীত গাইবার উপযুক্ত কণ্ঠ – এদুইয়ের মিলমিশ অনেক ক্ষেত্রেই হয়না, হয়নি। গণসংগীতের পথচলায় যে ঘটনা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।
- রাজনীতি-নিরপেক্ষতার দায় নিয়েও কমিউনিস্ট আদর্শকেই মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে বলে লাল পতাকা, লাল সূর্যের দিন, বা কৃষক-শ্রমিকের মুষ্টিবদ্ধ হাত-প্রভৃতি কতকগুলি ছকবাঁধা দৃশ্যকল্পে ছেয়ে গেছে গণসংগীতগুলি, যা একটা সময়ের পর মানুষের মনে একঘেয়েমির জন্ম দিয়েছে। আমজনতা, যাঁরা সে অর্থে ততটা রাজনীতি সচেতন নন, তাঁরা ওইসব গুটিকতক চেনা শব্দ শুনেই ‘পার্টির গান’ বলে গণসংগীতকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।

- গণসংগীতও যে মানুষের চিন্তাক্ষেত্র বদলের অন্যতম হাতিয়ার, অনেক রাজনৈতিক নেতা, বক্তারাই সেই কথাটি অনুধাবন করতে পারেননি। ব্যাপারটা বহু ক্ষেত্রেই দাঁড়িয়েছে এইরকম, অবশ্যই গণনাট্যের পরবর্তী সময়ে, গানবাজনা করে প্রথমে কিছু লোক জমিয়ে নেওয়া হল, তারপর সেখানে যে নেতা বক্তৃতা দেবেন, তিনি বক্তব্য রাখলেন। গণসংগীতের পক্ষে এ ঘটনা যথেষ্ট অপমানজনক।
- গণআন্দোলন থেকে জন্ম নিয়ে গণসংগীত সেই আন্দোলনকেই পুষ্ট করে। নকশালবাড়ি পরবর্তীকালে সেই অর্থে বৃহৎ গণঅভ্যুত্থান পশ্চিমবঙ্গ দেখেনি। কাজেই আশা রাখাও ঠিক না, বিভিন্ন সময়ে ঘটা বিছিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে দুটো-চারটে গান লেখা হলেও তা গণসংগীতের বিপুল ঐতিহ্যে নিজেদের অবস্থান স্থির করতে পারবে।
- আধুনিক বাংলা গানে কেবল নরনারীর প্রেমই বিষয়, আর কোন আবেগ- অনুভূতি, যেমন রাগ, হিংসা, জেদ, জীবনসংগ্রাম- এসবের জায়গা নেই। আবার গণসংগীতে ঐ প্রতিদিনকার বেঁচে থাকার লড়াইটাই আছে, নরনারীর প্রেম বা আর কোন মোলায়েম অনুভূতি সেখানে, নৈব নৈব চ! বাংলা গানের এই দুটি ধারা তাই সম্পূর্ণই উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। জীবনমুখী বাংলা গান সেই সংরূপ, যেখানে বিদ্রোহ আছে, প্রেমও আছে। আসলে জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ এক আবেগকে মোটে প্রশ্রয় না দেওয়া গণসংগীতকে কখনো কখনো বড্ড রুক্ষ মনে হয় কারো কারো। তার মানে এ কথা বলা হচ্ছে না যে, গণসংগীতে ‘প্রেম’ এর অনুপ্রবেশ ঘটুক, বা ঘটলে ভালো হত! কেবল বলতে চাওয়া হচ্ছে এই, ‘গণসংগীত’ শব্দটা শুনলেই একটা কঠিন সাংগীতিক কাঠামো কেউ কেউ ভেবে ফেলেন- গণসংগীতের হারিয়ে যাওয়াতে এই বিষয়টা কাজ করেছে। গণনাট্য বিষয়ক একটি সাক্ষাৎকারে ‘গণসংগীতে স্লোগান ব্যবহার’ প্রসঙ্গে সলিল চৌধুরীর বক্তব্যের সঙ্গে এই জায়গায় সহমত হওয়া গেল-

  “আমার বক্তব্য হচ্ছে, সব গান, সব কবিতাই সর্বদা স্লোগান দিয়ে শেষ করতে হবে এটা ঠিক নয়। কোথাও কোথাও স্লোগান নিশ্চয়ই আসবে, বিষয়ের প্রয়োজনেই। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত প্রেম ভালোবাসা ব্যক্তিগত দুঃখবেদনারও তো স্থান থাকা চাই গানে? আমি তো মনে করি মানুষের

এই ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলো আছে বলেই মানুষ সংগ্রাম করে। জীবন একটা total ব্যাপার, তার নানা দিক আছে, তার সবটাকেই ধরতে হবে গানে। "[১]

সূত্রনির্দেশ

১. চৌধুরী সলিল, লাহিড়ী আশীষ ও অন্যান্য গৃহীত সলিল চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, গুপ্ত সমীরকুমার(সম্পা.), *রচনাবলী সলিল চৌধুরী,* মিলেমিশে, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩৮০

গ্রন্থপঞ্জি

১. আচার্য অনিল (সম্পা.), *তিন দশকের গণ আন্দোলন,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১৮

২. আচার্য অনিল (সম্পা.), *সত্তর দশক দ্বিতীয় খণ্ড,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১৪

৩. গুপ্ত সমীরকুমার, *উড়ো মেঘ,* পত্রপুট, কলকাতা, ২০০০

৪. গুপ্ত সমীরকুমার, *সলিল চৌধুরী প্রথম জীবন ও গণসঙ্গীত,* মিলেমিশে, কলকাতা, ২০১১

৫. গোস্বামী পরিমল (সম্পা.), *মহামন্বন্তর,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৪

৬. গোস্বামী সত্রাজিৎ, *বানভাসি সময়ের গান,* পরম্পরা, কলকাতা, ২০১০

৭. চক্রবর্তী সুধীর (সম্পা.), *আধুনিক বাংলা গান,* প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১৫

৮. চট্টোপাধ্যায় অলক (সম্পা.), *ব্যাকুল বাঁশরি,* আজকাল, কলকাতা, ২০১১

৯. চৌধুরী খালেদ, *লোকসংগীতের প্রাসঙ্গিকতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০৪

১০. চৌধুরী দর্শন, *গণনাট্য আন্দোলন,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০০৯

১১. চৌধুরী সলিল, *রচনাবলী সলিল চৌধুরী,* গুপ্ত সমীরকুমার (সম্পা.), মিলেমিশে, কলকাতা, ২০১৫

১২. চৌধুরী সলিল, *সলিল চৌধুরী রচনাসংগ্রহ প্রথম খণ্ড,* চৌধুরী সবিতা ও অন্যান্য (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩

১৩. চৌধুরী সুভাষ (সম্পা.), *মুক্তির গান প্রথম খণ্ড,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৩

১৪. চৌধুরী সুভাষ (সম্পা.), *মুক্তির গান দ্বিতীয় খণ্ড,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৬

১৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, *গীতবিতান,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

১৬. দাশগুপ্ত বাবলু (সম্পা.), *সেই বাঁশিওয়ালা,* গণনাট্য প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৪

১৭. দাশগুপ্ত বাসব, *জর্জ,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩

১৮. নাথ নির্মল, *আধুনিক বাংলা গান স্বর্ণযুগের ইতিবৃত্ত (১৯৩০-১৯৮০) প্রথম খণ্ড,* এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

১৯. পণ্ডিত নিবারণ, *নিবারণ পণ্ডিতের গান,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৮

২০. বন্দ্যোপাধ্যায় অভিজিৎ, *বাংলা গানের পথচলা,* আজকাল, কলকাতা, ২০১৪

২১. বসু অরুণকুমার, *সলিল থেকে সুমন এবং তারপর,* সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০১

২২. বিশ্বাস দেবব্রত, *ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩

২৩. বিশ্বাস হেমাঙ্গ, *উজান গাঙ বাইয়া,* বিশ্বাস মৈনাক (সম্পা.), অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১৮

২৪. বিশ্বাস হেমাঙ্গ, *হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনাসংগ্রহ ১,* বিশ্বাস প্রণব ও বিশ্বাস রঙিলী (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১২

২৫. ভট্টাচার্য রত্না ও মুখোপাধ্যায় শঙ্কর (সম্পা.), *সুবোধ পুরকায়স্থর গান,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৫

২৬. মাইতি শুভেন্দু, *নানা লেখা,* আজকাল, কলকাতা, ২০০৯

২৭. মিত্র সুচিত্রা, *মনে রেখো,* আজকাল, কলকাতা, ২০১৪

২৮. মৈত্র জ্যোতিরিন্দ্র, *নবজীবনের গান ও অন্যান্য,* ইন্দিরা, কলকাতা, ১৯৯৬

২৯. মৈত্র জ্যোতিরিন্দ্র, *রচনাসংগ্রহ,* দাশগুপ্ত শিবাদিত্য (সম্পা.), সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১২

৩০. রায় অনুরাধা, *চল্লিশ দশকের বাংলায় গণসংগীত আন্দোলন,* প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯২

৩১. রায় বুদ্ধদেব ও রুদ্র সুব্রত (সম্পা.), *গণসংগীত স্বরলিপি,* নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১২

৩২. রুদ্র সুব্রত (সম্পা.), *গণসংগীত সংগ্রহ,* নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৯০

৩৩. রুদ্র সুব্রত (সম্পা.), *১০১ টি গণসংগীত স্বরলিপি,* নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১

৩৪. রোবসন পল, *যে পথে দাঁড়িয়ে,* চক্রবর্তী দীপেন্দু (অনু.), অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১২

৩৫. সুমন কবীর, *সুমনের গান সুমনের ভাষ্য,* সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৪

৩৬. সুমন কবীর, *হয়ে ওঠা গান,* সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১২

৩৭. সোম স্বপন (সম্পা.), *বেঁধেছি আমার স্মরণবীণ কবি শ্যামল গুপ্তের গীতিরচনা,* তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ

৩৮. সোম স্বপন (সম্পা.), *সুচিত্রা,* কারিগর, কলকাতা, ২০১৭

৩৯. সোম, স্বপন, *সুরের পথের হাওয়ায়,* কারিগর, কলকাতা, ২০১৭

পত্রপত্রিকাপঞ্জি

১. আচার্য অনিল (সম্পা.), *অনুষ্টুপ - প্রাক শারদীয় সংগীত সংখ্যা,* কলকাতা, ২০১৪

২. ঘোষ ড. প্রদীপকুমার (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা ৩*, কলকাতা, ১৯৯৮

৩. ঘোষ ড. প্রদীপকুমার (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা ৪,* কলকাতা, ১৯৯৯

৪. ঘোষ ড. প্রদীপকুমার (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা ৬,* কলকাতা, ২০০৪

৫. ঘোষ ড. প্রদীপকুমার (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা ৭,* কলকাতা, ২০০৫

৬. চক্রবর্তী সুধীর (সম্পা.), *ধ্রুবপদ-প্রসঙ্গ বাংলা গান,* কৃষ্ণনগর, ১৯৯৯

৭. চট্টোপাধ্যায় অনিন্দ্য (সম্পা.), *রোববার-রানার সংখ্যা,* কলকাতা ২০১৪

৮. দাশ জ্যোতির্ময় (সম্পা.), *মিলেমিশে,* কলকাতা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮

৯. দাস সুখেন্দু ও অন্যান্য (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা-বাংলা সংগীত বিশেষ সংখ্যা,* কলকাতা, ২০০৫

১০. দাস সুখেন্দু ও অন্যান্য (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা-বাংলা সংগীত বিশেষ সংখ্যা,* কলকাতা, ২০০৬

১১. দে অরুণ (সম্পা.), *অবাক হয়ে শুনি,* কলকাতা, ২০১৫

১২. ধর প্রসূন (সম্পা.), *সংবর্তক-হেমাঙ্গ বিশ্বাস বিশেষ সংখ্যা,* কলকাতা, ২০১২

১৩. রায় তাপস (সম্পা.), *ত্বষ্টা সাময়িকী-বিষয় বাংলা গান,* শিলং, ১৯৯৮

১৪. রায়চৌধুরী সুব্রত (সম্পা.), *তথ্যসূত্র-বাঙালি গীতিকার সংখ্যা,* কলকাতা, ২০১৬

১৫. লাহিড়ী সৌমিত্র ও ভট্টাচার্য তন্ময় (সম্পা.), *বাংলা সংগীতমেলা পত্রিকা,* কলকাতা ২০০০

১৬. সাধুখাঁ সুদীপ্ত (সম্পা.), *শহর-বাংলা গান সংখ্যা,* কলকাতা, ২০১২

পরিশিষ্ট

শুভেন্দু মাইতির সঙ্গে কিছুক্ষণ

প্রশ্ন : আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলব তা হল তা হল 'গণসংগীত' এর তাত্ত্বিক দিক। বাংলা গণসংগীতের শুরু, তার ইতিহাস, তারপর যাঁরা যেরকমভাবে বিখ্যাত করেছেন এই বিশেষ চেতনার গানকে, তাঁদের কথা, যেভাবে করলেন সেই কথা, আবার যাঁরা বিখ্যাত হলেননা আদৌ, তাঁদেরও কথা- এই সব বিষয় নিয়েই যদি কিছুক্ষণ আলাপ করা যায়...

তবে প্রথমে শুনব আপনার মুখে 'গণসংগীত' এর সংজ্ঞা...

- 'গণসংগীত' এই শব্দটা সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু 'গণনাট্য সংঘ' সৃষ্টি হওয়ার পর। তার আগে যে গণসংগীত ছিল না বা এই ধরণের গান গাওয়া হত না, এটা কিন্তু ঠিক না। হতই। 'গণনাট্য সংঘ' সৃষ্টি হওয়ার আগেও গণসংগীত ছিল। কিন্তু 'গণসংগীত' এই টার্মটা ছিল না।

ধরো মানুষ যেদিন থেকে মানুষের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছে, সেদিন থেকে তার গান তৈরি হয়েছে। প্রতিটি লড়াইয়ের পিছনে কিন্তু গান আছে। সাঁওতাল বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ যতরকম বিদ্রোহ হয়েছে সব বিদ্রোহের গান আছে। তখন কিন্তু 'গণনাট্য সংঘ' এর জন্ম হয়নি। অবশ্যই সেগুলিও গণসংগীত।

প্রশ্ন : লোকসংগীতও মানুষের যন্ত্রণার কথা বলে, তাহলে 'গণসংগীত' এর সঙ্গে ফারাকটা...

- লোকসংগীত হচ্ছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের যে সংগ্রাম তার থেকে উত্থিত। "চিড়া কুটি চিড়া কুটি মউল গাছের তলেতে/ ও দিদি কুটুম আইসাছে বাড়িতে", দেখো, তালটা দেখো! একসাথে দুটো মেয়ে ঢেঁকিতে পাড় দেবে আর যে ঢেঁকির গোড়ায় বসে আছে, ধানটা কাছিয়ে দেবে, যদি তালটা না থাকে পাড়টা হাতে পড়ে যাবে কিন্তু! এই ঢেঁকি পাড় দেওয়ার শ্রম থেকে একটা গান উঠে এল তার প্রয়োজনেই। তাহলে লোকসংগীত হল

শ্রমজাত সংগীত। আবার "তালই পালঙ্কে ঘুমাইসে/ সোনা মাঙ্গই গো/ তালই পালঙ্কে ঘুমাইসে"- মেয়েদের ছাদ পেটার গান। আরো আছে! "সারাদিন পিটি কার দালানের ছাত গো/ পিটব রে ভাত পাই না, ঘুরে আসি হাত গো"- এই গানটা যেমন। গানের তালে তালে এতে ছাত পেটার শ্রম লাঘব হচ্ছে। আবার নৌকা বাওয়ার সময় গাওয়া হয়- "নাও ছাড়াইয়া দে/ বাদাম উড়াইয়া দে"- দশটা লোক একইসঙ্গে, একই রিদম্ এ যদি দাঁড় না বায়, নৌকো কিন্তু ডুববে। আবার পাথর গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বলছে 'হেঁইও হেঁইও'-নির্দিষ্ট সময় পরপর। সঙ্গীতের দরকার এইসব জায়গায়।

কিন্তু মানুষ তো সারাদিন শ্রম করে না। তার বিশ্রাম আছে, তার কষ্ট আছে, আনন্দ আছে, প্রেম আছে, দুঃখ আছে, অভিমান আছে- তাহলে শ্রমজীবী মানুষের এই অনুভবগুলোও গানে আসে। আর এগুলোও লোকসংগীত। অর্থাৎ গুছিয়ে বলতে গেলে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের যে সংগ্রাম, তার থেকে উত্থিত সুর ও ছন্দ, অতএব শ্রমজাত সংগীত, আর শ্রমজীবী মানুষের অবসর বিনোদনের সংগীত- লোকসংগীত এই দুটো দিকই তুলে ধরে।

এই প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের যে সংগ্রাম সেটা কালক্রমে একদিন মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। একটা মানুষ একটা মানুষকে শোষণ করে। একটা মানুষ একটা মানুষের ওপর অত্যাচার করে। তার বিরুদ্ধাচারণ করে লেখা হল 'গণসংগীত', শ্রেণিসংগ্রাম যার মূল কথা।

প্রশ্ন : যখন ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল আমাদের দেশ, তখন ইংরেজরাও এ দেশের লোককে যথেচ্ছ শোষণ করেছে, নির্মম অত্যাচার করেছে তাদের উপর, তাহলে তখন সেই অত্যাচারের প্রতিবাদ করে লেখা গানকেও কি আমরা 'গণসংগীত' বলতে পারি? কেন সেই গানগুলিকে আমরা 'স্বদেশী গান' বললাম?

- সারা পৃথিবীতে দু'শ্রেণির মানুষ আছে। একদল খেটে খায়। অন্যদল খাটিয়ে খায়। অন্যলোককে খাটিয়ে খায়। অর্থাৎ পরের শ্রমে বাঁচে। এই দুইয়ের ভেতর যে সংঘাত, সেটা হল গণসংগীতের মূল প্রাণভোমরা। ওই যাকে শ্রেণিসংগ্রাম বললাম। মানুষের বিরুদ্ধে

মানুষের সংগ্রাম। আর 'স্বদেশী গান' হল সেই গান যেখানে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠা মানুষ, গরীব, খেটে খাওয়া, খাটিয়ে খাওয়া সবাই এক মঞ্চে, একসাথে দেশমাতৃকার বন্দনা করে, দেশের স্বাধীনতা কামনা করে। এখানে বড়লোক, গরীব, রাজা, মহারাজার কোন ভেদ নেই- সবাই একসাথে লড়াই করে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বাঁচাবার জন্য। তাই 'স্বদেশী গান' কিন্তু 'গণসংগীত' না।

প্রশ্ন : কিন্তু স্বদেশী গানগুলি যদি লেখা না হত, মানে যদি লেখা না ই হত "ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝঞ্ঝনা/ এ যে মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা/ এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা/ মোদের অশ্রু দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল" এইসব লাইন, তাহলে 'গণসংগীত' এর এসে পড়াটা কি খুব সহজ হত? আমাদের বাংলায়?

- এটা (স্বদেশী গান) একটা স্টেপ। সিঁড়ি না হলেও দোতলায় উঠতে পারব। সিঁড়ি হলে ঐ দোতলায় ওঠাটা কমফর্টেবল হবে। গানের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেরকম। গণসংগীতের এই যাত্রাপথ- তাতে কেবল পরিবেশ, প্রয়োজনে সৃষ্টি হওয়া স্বদেশী গান নয়, এমন অনেক গান আছে যেগুলি 'গণসংগীত' এর জন্মকে অনিবার্য করেছে।

১৯৪১ সালে একটি গান HMV কোম্পানি প্রকাশ করে, যেখানে গীতিকারের জায়গাটা 'অজ্ঞাত' লেখা আছে। গানটি গেয়েছিলেন মৃণালকান্তি ঘোষ। সেখানে বলা হয়েছে বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত পৃথিবীর কথা, মহামারী, মন্বন্তর- এসবের কথা। প্রশ্ন করছেন গীতিকার শ্যামাকে, বলছেন, "শ্যামা আমার নীরব কেন মা?/ রোদন ভরা বিশ্বমাঝে কানে কি তোর যায় না কাঁদন?/মহাকালের শঙ্খ বাজে..." কেন তাঁর হাতের খড়্গ ঝলসাচ্ছে না এই অন্যায়, অনাচার দেখেও, এ ই তাঁর জিজ্ঞাসা। তারপর গানটার কথাগুলো এরকম-

তোর ছেলে মা অনাহারে, ঘুরে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে
মেয়ে যে তোর নিরাবরণ, সে কি মা তোর বুকে বাজে?
দেশ জুড়ে মা হিংসা খালি, হানাহানি চলছে কত,
ত্রিনয়না তবু কি তুই দেখিস মা পীড়ন যত?
কী ফুল আজি দেব মা পায়ে?

রাঙা জবা শুধু ঝরে যায়...
তুই যদি মা জগতমাতা,
নীরব থাকা তোর কি সাজে?

এগুলোই 'গণসংগীত' এর আদি পিতা। পৃথিবীতে কোন কিছু আকাশ থেকে পড়ে না। গণসংগীতও আকাশ থেকে পড়েনি। গণসংগীত একটা সংগ্রামের প্রবাহ বেয়ে এসেছে। জন্মকালে একরকম রূপ ছিল তার, আজকে তার নতুন রূপ। আজকের গণসংগীত, তার সঙ্গে '৪৩ সালের গণসংগীতের তফাত আছে। '৪৬ সালে HMV কোম্পানি কিছু গান পাবলিশ করছে, তেমনই একটা গানের লাইনে বলা হচ্ছে- "পরাধীন দেশে প্রেম চির অভিশপ্ত/ মুক্তির পথে কত বাধা কত রক্ত/ মহামিলনের স্বপ্ন আমার ভেঙে যায় বারেবারে"- প্রেমসংগীত তো এটা, দেখছি নরনারীর প্রেমের সেতু হিসেবে কেবল চাঁদ, ফুল, তারা, আকাশ নয়, সেই প্রেমের মধ্যে 'দেশ' এসে হাজির হচ্ছে। যেমন আবার ওই গানটা "পৃথিবী আমারে চায়/ রেখো না বেঁধে আমায়/ খুলে দাও প্রিয়া/ খুলে দাও বাহুডোর"। এই গানগুলিতে গণসংগীতের উপাদান কে অস্বীকার করবে?

প্রশ্ন : যাঁরা 'গণসংগীত' নিয়ে লেখালেখি করেছেন, করেন, তাঁরা সকলেই প্রায় এক বিষয়ে সহমত- একটা সময়ের পর থেকে গণসংগীতের যাত্রা থমকে গেছে। এ রাজ্যে বাম জমানা ফুরনোর ব্যাপারটিকেই তাঁরা মূলত এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করতে চান।

- (প্রশ্ন শেষ করতে না দিয়ে) বাম জমানা শেষ হয়ে গেছে মানে কী? সরকারে না থাকা মানেই জমানা শেষ হওয়া? এই যে ভ্রান্তি...! আচ্ছা ধরো, বামপন্থীরা ব্রিগেডে যে সমাবেশটা করল (৩ রা ফেব্রুয়ারি,২০১৯), আর কোন একটি পার্টি ক্ষমতায় না থাকা সত্ত্বেও এমন একটা সমাবেশ করে দেখাক তো দেখি! কার কত ক্ষমতা! আমার বামপন্থীদের সম্পর্কে অনেক অভিযোগ আছে এদেশে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলছি, অন্য কোন পার্টি করে দেখাক না, ক্ষমতায় না থাকা সত্ত্বেও এমন সমাবেশ? বাম জমানা তাই শেষ হয়নি। বরং সরকারে থাকাকালীন বামেদের কিছু স্খলন ঘটেছিল। রাষ্ট্র একটা এমন অদ্ভুত

ব্যাপার, তার ছত্রছায়ায় থাকলে বামপন্থীদেরও বিচ্যুতি ঘটে। তারাও কোথাও কোথাও কখনো কখনো চৈতন্য থেকে চ্যুত হয়। মধুলোভী ভোমরাদের ভিড় হয়। যেহেতু গণসংগীত হল লড়াই, আন্দোলন থেকে জন্ম নেওয়া সংগীত- শ্রমিক আন্দোলন, চা শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন-সেখান থেকে উদ্ভুত সংগীত, যা ফিরে গিয়ে ওই আন্দোলনকেই উদ্বুদ্ধ করে। ওই আন্দোলনে যখন ভাঁটা পড়ে, তখন গান আর লেখা হয় না! তাই বামপন্থীদের জমানা তখন শেষ হবে যখন আন্দোলন করতে ভুলে যাবে তারা, শুধু সরকারে থাকার জন্য।

প্রশ্ন : এরাজ্যে বামেদের ৩৪ বছরের রাজত্বে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন গান উঠে এল না কেন বলে আপনার মনে হয়?

- ভালো গণসংগীত রচিত হল না, তার কারণ হল- প্রতিবাদের কথা বলতে গেলেই নেতাদের মনে হল, সরকারের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে না তো? তখন চলল, সরকার বাঁচাও কর্মসূচী। তা প্রতিবাদের কর্মসূচী না! আন্দোলন থেকেই তো ধীরে ধীরে সরে এল বামপন্থীরা!

প্রশ্ন : আজ যে গণসংগীত লেখা হচ্ছে, তার একটা দৃষ্টান্ত দিন না...

- ক'দিন আগেই জানো আমি লিখেছি-

আপন ঘরের খবর নে না।
শুধতে হবে তোর অনেক দেনা।
আপন ঘরের খবর নে না।
সে ঘরে কিছু ভুল আছে, কোণে কোথাও ঝুল আছে,
কড়ি-বরগা আর কপাটের রঙ একটু চটেছে!
তবু সেই ঘরেই কুটুম থাকে, সে তো দ্বার খুলে রাখে,
কে বলে সে তোর খবর রাখে না?
আপন ঘরের খবর নে না।
সেই ঘরেই বাস করি চল, চাবুক খাওয়াদের দল।
সেই ঘরেই আছে জানি স্বপ্নলোকের চাবি;

আহা পরম যতনে খুঁজব সেই রতনে, নজর রাখব যাতে কেউ বাধ সাধেনা!
আপন ঘরের খবর নে না!

ভুলভ্রান্তি আছে কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে। সেই জন্যই বলা- ঘরে কোথাও ভুল আছে, কোথাওবা ঝুল আছে, কড়ি-বরগা, কপাটের রঙ চটেছে, তবু সেটাই আমার কুটুমবাড়ি! আমার অট্টালিকা-প্রাসাদের দরকার নেই। সেই ঘরেই বাস করতে হবে আমাদের, আমরা হলাম চাবুক খাওয়ার দল!

প্রশ্ন : সলিল চৌধুরীর সঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বিরোধ ঘটেছিল গণসংগীতের ফর্মকে ঘিরে। আপনি কোন্ পক্ষ নেবেন?

- প্রথম বোম্বাই কংগ্রেস থেকেই এই বিরোধটা বেধেছিল। সলিলের একটা চেষ্টা ছিল বাংলা গণসংগীতে আন্তর্জাতিকতার ছোঁয়া নিয়ে আসা। তাতে তিনি সফল। আমাদের মধ্যবিত্ত চেতনায় সলিল তাঁর প্রভাব রেখে গেছেন। কিন্তু গ্রামের লোকেদের মধ্যে কী হয়, শোনো-

একদিন সুন্দরবনের কাছে মোল্লাখালি নামের এক গ্রামে গেছি। একটা ছোট খেতমজুর সমাবেশে। গাইলাম "ঢেউ উঠছে কারা টুটছে", তারপর গাইলাম হেমাঙ্গদার 'শঙ্খচিল'। দুটো গান, তিনটে গান এরকম গাইবার পর ওই লোকগুলো বলল, "বাবু, এবার একটা বাংলা গান গাও না!" কারণ, সত্যিই, এই ভাষা তারা জানেনা। তাদের ল্যাঙ্গোয়েজে গান বেঁধে তাদের শোনাতে হবে। গোটা ব্যাপারটাই আমরা আসলে দেখি মধ্যবিত্ত মানসিকতা নিয়ে, গানের সাফল্য-ব্যর্থতা, জোয়ার-ভাঁটা এভাবেই আমরা বিচার করি। 'শ্রমিক জাগো', 'কৃষক জাগো'-এই কথাগুলি ড্রয়িংরুমে বসে লিখলে হবে না। তাদের মাঝে, তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। "কাস্তেটারে দিও জোরে শান, কিষাণ ভাই রে"- এ কথা বলবার তুমি কে হে? 'জাগো শ্রমিক', 'জাগো কৃষক' বলে তুমি নিজেই ঘুমিয়ে আছো! এগুলো দ্বিচারিতা, স্পর্ধা, মধ্যবিত্ত স্পর্ধা। গণসংগীতকে এর থেকে মুক্ত

হতে হবে। তিনি সলিলই হোন আর হেমাঙ্গ বিশ্বাসই হোন, যে ই হোন না কেন! আমার কাছে অনেক বেশি কাম্য হয়ে উঠবে কে? গুরুদাস পাল, নিবারণ পন্ডিত- এঁরা!

কাক মরিলে কাক যে কান্দে জুটে এক জায়গায়।
মানুষ মরিসে, গরীব ভাই সব, আয়রে ছুটে আয়।

এই হল ওই মানুষগুলোর বুকের ভাষা, মুখের ভাষা, এই ভাষাতেই তাদের মত করেই লিখতে হবে গান।

প্রশ্ন : 'গণসংগীত' ঠিক যেমনভাবে, যে ভাষায় পৌঁছে দিতে হবে বলছেন শ্রমিক, কৃষক- এদের কাছে, একজন শহুরে, নাগরিক মানুষ পারবেন কোনদিন সেই গানের বাণীর অ্যাকসেন্ট নিজের মধ্যে নিতে, উপযুক্ত মেঠো গলা তৈরি করতে?

- আমি তো নাগরিক মানুষ। আঠেরো বছর বয়স অবধি গ্রামে থেকেছি। তারপর তো শহরেই বেড়ে ওঠা- আমি পারলাম কী করে?

প্রশ্ন : মানুষ, মানে এই বিশেষ চেতনাসম্পন্ন মানুষ তবে 'গণসংগীত' শিখছে না কেন?

- আরে, এই চেতনাটারই তো অভাব! একটা মানুষ সারাজীবন গ্রামে না গিয়েও, শহরে থেকেও, বুকের মধ্যে একটা আস্ত গ্রাম বসিয়ে রাখতে পারে; আবার একটা লোক সারাজীবন গ্রামেই থাকল, কিন্তু তার বুকের ভিতর ইঁট, কাঠ, পাথর- এমনও হতে পারে। সত্যজিৎ গ্রামে থাকেননি, 'পথের পাঁচালি' তিনিই করেছেন। ইন্দির ঠাকরুণের ওই ইল্যুশন, ভাবা যায় লোকটা গ্রামে থাকেনি কখনো? এগুলো ওঁর মস্তিষ্কের আলাদা বিষয়। বাস্তববোধ যেমন থাকা দরকার, রোম্যান্টিসিজম্ও লাগবে। দুইয়ে মিলে নান্দনিকতা। সৌরিন সেন এর ভিয়েতনাম পড়বে, পড়ে বুঝবে না, লোকটা ভিয়েতনাম কোনদিন যায়নি! বাস্তবতা, কল্পনার সুবিবাহ হল নন্দনতত্ত্ব, অ্যাসথেটিকস্। বিভূতিভূষণের পক্ষে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল। সাধারণ লোকে তা পারে না। রবীন্দ্রনাথকেও বলতে হয়েছে-" জীবনে জীবন যোগ করা, নইলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা"। জানো, রবীন্দ্রনাথের গান ধরে ধরে দেখানো যেতে পারে 'গণসংগীত' কাকে বলে!

- ঠিক তাই। এইটা নিয়ে বারবার ভেবেছি নিজের মতো।

- 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো', 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো' বা 'কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন'- এরকম আরো কত গান, এগুলি গণসংগীত না হলে গণসংগীত আর কাকে বলে?

- তাই তো। দেবব্রত, সুচিত্রা –এঁরা প্রমাণও করেছেন এই কথা বারেবারে।

প্রশ্ন : আচ্ছা, এখন কারা, গ্রামের মানুষজন গণসংগীত লিখছেন, সুর করছেন, গাইছেন, আপনার পরিচিত?

- বাঁকুড়ার রবি বাগদীর একটা গানের কথা বলি-

মা দুগ্‌গা আসছ যদি গো, সঙ্গে এবার আনবি মিশিনগান!
ও মা তোর, অসুরদের ওই অত্যাচারে, ও তোর ছেলেদের বাঁচে না প্রাণ!
একটা অসুর মেরে মা গো পাবি না তুই ছুটি,
এখন সারা দেশে, পথে-ঘাটে ওরাই কোটি কোটি।
আর তুই দশহাত দিয়ে মারবি মা গো, আমি করব যে তোর গুণগান!
অসুরে যদি ছোরা ফেলে হাতে নেয় গো কামান,
আরে একবার দেগে দিলে ভুলি দিবেক বাপের নাম!
তাই দেখে-শুনে যাবি মা গো, নইলে অকালে হারাবি প্রাণ।
একটা কথা রাখছি বলে, রাখবি মা তুই মনে,
গোটা চারেক সাদ্দাম হুসেন পাঠাবি ভুবনে!
আরে তোর খাটালি কমবে মা গো, ইরাকে আছে তার প্রমাণ!

চমৎকার না? এছাড়াও দিনাজপুরে আছেন তরণীমোহন বিশ্বাস, পুরুলিয়ার স্বপন হুজুরী, মেদিনীপুরের গোপাল অধিকারী, অমল নায়েক, সুনীল জানা, বীরভূমের সন্তোষ কর্মকার...এঁদের সঙ্গে তোমার শিগগির পরিচয় করিয়ে দেব।

- নিশ্চয়ই চাই আমি। আপাতত আপনার লেখা বিখ্যাত একটি গান বিষয়ে কৌতূহল আছে, সেইটি বলি। আচ্ছা, এই যে গানটি-

মঈনুদ্দীন কেমন আছো?
বড্ড বেশি ঘুম পাচ্ছে!
মঈনুদ্দীন ঘুমকে তাড়াও।
সময় এখন খ্যামটা নাচ্ছে!

- এই মঈনুদ্দীন কে?

- মঈনুদ্দীন আমার বাল্যবন্ধু। আমার গ্রাম নন্দীগ্রাম। সেইখানকার কৃষক আন্দোলনের কর্মীও বটে মঈনুদ্দীন। কেউ কোন অসুবিধায় পড়লে, সে যেমন অসুবিধাই হোক, ছুটে যেত ছেলেটা। একবার মহরমকে কেন্দ্র করে গ্রামে প্রবল অশান্তি হয়। সাম্প্রদায়িক গোলমাল। সেই ঘটনায় ও মনে মনে আহত হয় খুব। আমাদের গ্রামে ধর্ম নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হবে?- এটা ও মেনে নিতে পারে না। তারপর থেকেই মঈনুদ্দীন কেমন আনমনা হয়ে যায়। কৃষকসভায় যায় না, কোথাও যায় না। এটা আজ থেকে প্রায় ৩৫ বছর আগের ঘটনা। এরপর একদিন মঈনুদ্দীনের সঙ্গে বাসে দেখা। প্রাণচঞ্চল মঈনুদ্দীন কত পাল্টে গেছে- সেদিন আরো ভালো বুঝলাম। তারপরই এই গানটা লিখি।

- আরো অনেক কথা জানা বাকি থেকে গেল। ভবিষ্যতে সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম ।

- বেশ তো!

(এই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল ৬ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে)